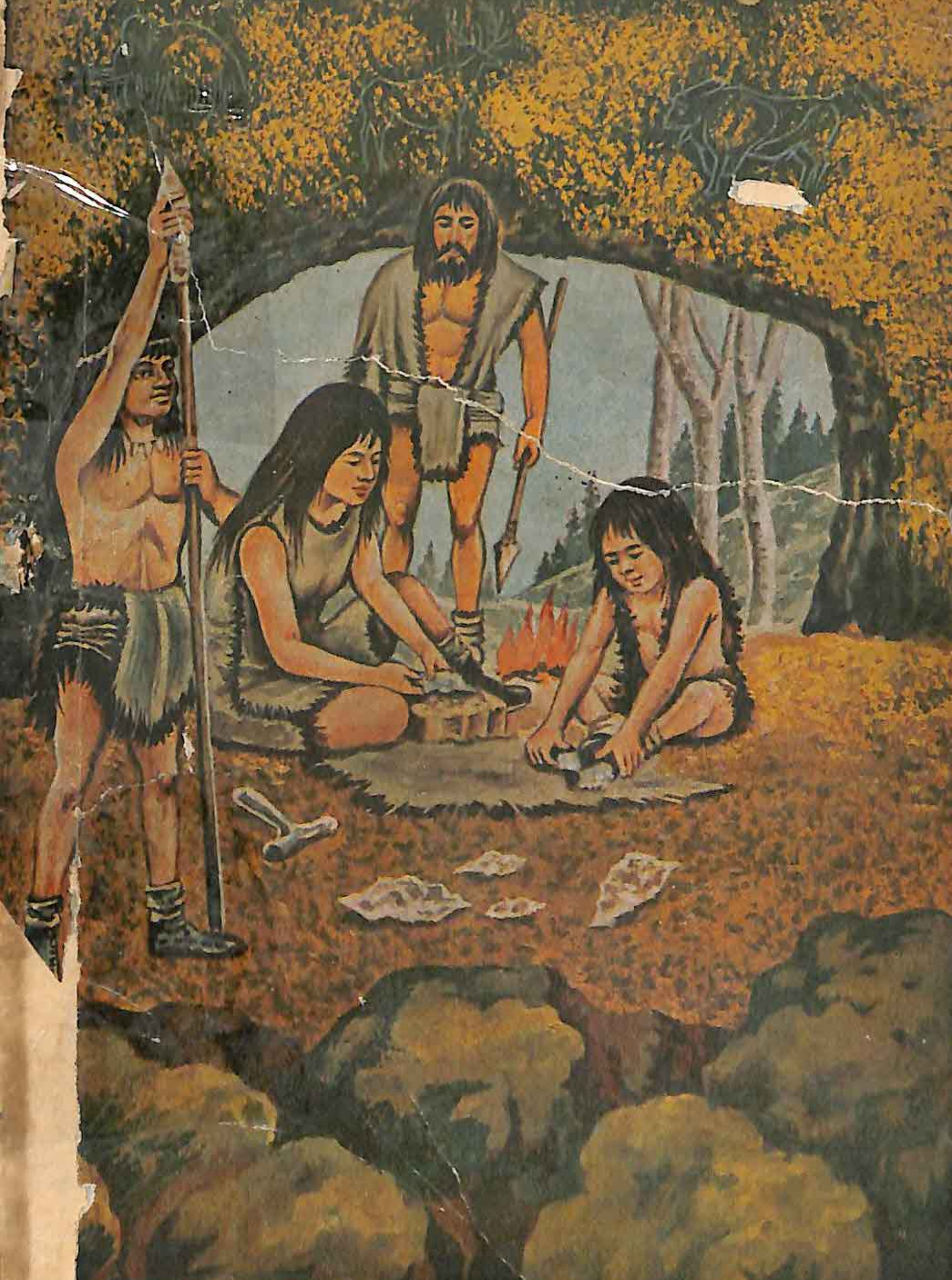
সভ্যতার পরিচয়



Approved by the Board of Secondary Education
West Bengal as a Text Book for Class VI
Vide T. B. No. VI|H|79|28 Dated 5.12.79

সভ্যতার পরিচয়

[সংশোধিত সংস্করণ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

বইখানির বিশেষত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করেছেন, তাঁদের নির্দেশ অনুসারেই বইখানি রচনা করা হয়েছে। সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীগণ যাতে সহজে বুঝতে পারে, সেজন্য যতদূর সম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে প্রয়োজনীয় কালপঞ্জী এবং পর্ষদ নির্দেশিত রচনাত্মক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন, বিষয়মুখী প্রশ্নের সমাবেশ করা হয়েছে, এছাড়া চিত্রের সাহায্যে কঠিন বিষয়গুলিকে সহজভাবে বোঝান হয়েছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ
এম. এ. এল. এল. বি. ;
প্রধান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ।

ও

শ্রীসুধাংশু সামন্ত, এম. এ.
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ।

মন্ডল এন্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীরকুমার মন্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মূল্য ঃ ৯·৫০ পয়সা

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৭৯
সংশোধিত প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৭৯
তৃতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮০
চতুর্থ সংশোধিত প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৮০
পঞ্চম সংস্করণ ডিসেম্বর, ১৯৮২

মুদ্রক ঃ
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বেরা
এস এন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

অধ্যায়

১

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস কেন পড়ব ?

ইতিহাস বলতে কি বোঝায় ঃ ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কথা বোঝায়। আদিম যুগের মানুষ ধাপে ধাপে নানা স্তর পার হয়ে আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জন্মের সময় থেকে মানব-সভ্যতার এই বিবর্তনের ধারা নদীর স্রোতের মত আজও বয়ে চলেছে। এর কোথাও ছেদ নেই, কোনও বিরাম নেই। এই বিরাম-বিহীন চলার পথে নানা অবস্থার মধ্যে পড়েও মানুষ গড়ে তুলেছে তার সমাজ ও সংস্কৃতি। এর জন্য তাকে যুগের পর যুগ ধরে নানা পরিবেশের সঙ্গে চালাতে হয়েছে আপসহীন সংগ্রাম। মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামের কথাই হলো ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাই ইতিহাস শুধু রাজা-মহারাজাদের বিলাসময় জীবনযাত্রার বিবরণমাত্র নয় বা তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের রোমাঞ্চকর কোন কাহিনী নয়, ইতিহাস হলো সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের এক ধারাবাহিক বিবরণ।

কেন ইতিহাস পড়ব ঃ এখন প্রশ্ন হলো কেন আমরা ইতিহাস পড়ব? আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাস মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনী। তাই সুদূর অতীত থেকে মানুষ কিভাবে ধাপে ধাপে তার আজকের সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা জানতে হলে আমাদের অতি অবশ্যই ইতিহাস পড়তে হবে। ইতিহাস অতীতের ঘটনাবলীর বিবরণ হলেও এর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথচলার নির্দেশ খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা তাঁদের সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার সময় কিভাবে এগিয়েছেন, তা জানা থাকলে আমরাও আমাদের বর্তমান সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিভাবে প্রাচীন যুগের মানুষদের কথা জানা যায় ?

প্রাচীন ইতিহাস জানবার উপায় ঃ আমাদের সকলেরই প্রাচীনকালের মানুষদের কথা জানার ইচ্ছা হয়। কিন্তু একেবারে আদিম যুগের মানুষ লিখতে জানত না। কাজেই কোন বই বা লিখিত বিবরণ থেকে তাদের কথা জানা সম্ভব নয়। হাজার হাজার বছর আগেকার এইসব মানুষের কথা, তাদের জীবনযাত্রার পরিচয় ও তাদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী তাহলে কেমন করে জানা সম্ভব হয়েছে? এখনকার মত তখনও মানুষ গ্রামে ও শহরে বাস করত। নানা কারণে এই সব জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কালক্রমে এই সব জায়গা মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে যায়। পণ্ডিতেরা এই সব স্থান খুঁড়ে এক হাজার, দু'হাজার বছর কিংবা আরও আগেকার মানুষের তৈরী অনেক জিনিস পেয়েছেন। এই রকম মাটি খুঁড়ে প্রাচীন জিনিসের সন্ধানকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য বলে। আর যে সকল পণ্ডিত এই কাজ পরিচালনা করেন তাঁদের বলা হয় **প্রত্নতত্ত্ববিদ**।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর নানা জায়গায় খোঁড়ার কাজ চালিয়ে প্রাচীন যুগের অনেক জিনিসপত্র আবিষ্কার করেছেন। এগুলির মধ্যে পাথরের তৈরী অমসৃণ ও ভোঁতা হাতিয়ারগুলিই সবচেয়ে পুরানো। পাহাড়-পর্বতের গুহায় এরকম হাতিয়ারের সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে বাইসন ও বল্গা হরিণের ছবি। কোন কোন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে পশু-পক্ষী ও মানুষের হাড় আর ছাই। আবার কোথাও বা আবিষ্কৃত হয়েছে পুরানো জিনিসপত্রের মধ্যে সুদৃশ্য পাত্রের টুকরো, গ্রাম, ঘরবাড়ি, মরা মানুষের কবর ইত্যাদি! এই সব জিনিসের সাহায্যে ঐ যুগের মানুষ আর তাদের জীবনযাত্রার অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। কিন্তু এই ইতিহাস মোটেই সম্পূর্ণ নয়। কেননা মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত জিনিসপত্রের ব্যবহারের সময় নিরূপণ করা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে এক কঠিন সমস্যা। তবে তারা ভূতত্ত্ববিদ ও প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান অনেকটা করতে পেরেছেন। ঐ জিনিসগুলি স্তর হিসাবে সাজিয়ে তাদের কোন্‌টা আগের কোন্‌টা পরের তা স্থির করা সম্ভব হয়েছে।

লিপি ঃ শুধু তাই নয়, মাটির তলায়, এমন কি মাটির উপরেও অজানা ভাষায় লেখা বহু লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এরকম প্রাচীন লিপি পাহাড়ের গায়ে, পাথরের ফলকে, মন্দিরের দেয়ালে এবং বিভিন্ন ধাতুফলকে খোদিত দেখা যায়। আবার এগুলির কোনটিতে করা হয়েছে রাজার গুণগান, কোনটিতে রয়েছে রাজার পুণ্য কাজের ঘোষণা, আবার কোনটিতে লেখা হয়েছে দানপত্রের দলিল বা ব্যবসা-বাণিজ্যের চুক্তিপত্র। দু-তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন যুগের লোকেরা যে ভাষায় কথা বলতেন কিংবা লিখতেন, সে সব ভাষা এখন আর বিশেষ প্রচলিত নেই। পণ্ডিতেরা অনেক পরিশ্রম করে নানা দেশের প্রাচীন ভাষার লুপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। এই সব ভাষা ও লিপি থেকে প্রাচীন ইতিহাস জানবার সুবিধা হয়েছে। অবশ্য সব প্রাচীন লিপি এখনও পড়তে পারা যায় নি।

মুদ্রা ঃ লিপি ছাড়াও ঐ যুগের মুদ্রা থেকে অনেক কথা জানা যায়। পৃথিবীর নানাস্থানে প্রাচীন যুগের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রায় সেকালের রাজার নাম, শাসনকালের সন, তারিখ ইত্যাদি থেকে অনেক বিষয় বুঝতে পারা যায়। আবার এক রাজ্যের মুদ্রা অন্য দেশে পাওয়া গেলে সেই দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক প্রমাণ করে।

পুঁথিপত্র ঃ মুদ্রার মত প্রাচীনকালে রচিত পুস্তক থেকেও সে যুগের ইতিহাস জানা যায়। সেকালের মানুষ গাছের ছাল বা ভূর্জপত্র, তালপাতা, মরা জীবজন্তুর চামড়া, প্যাপিরাস নামে এক রকমের নল খাগড়ার উপর তাদের অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার নানা কাহিনী লিখে রাখত। আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থ—**বেদ, রামায়ণ, মহাভারত** প্রভৃতি গাছের ছালের উপর লেখা হয়েছিল। এছাড়া প্রাচীন যুগের মানুষেরা নরম মাটির টালি বা মাটির ফলকে আঁচড় কেটে লিখে, পরে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নিত। **প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া** (বর্তমান ইরাক) দেশের লোকেরা এই ভাবেই তাদের জীবন-কাহিনী লিখে রেখে দিয়েছিল।


প্যাপিরাস

এই রকম বিভিন্ন উপাদান থেকে ঐতিহাসিকরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করতে পেরেছেন। এজন্য পণ্ডিতেরা বহু পরিশ্রম করে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। আমাদের দেশে অনেক ধ্বংসস্তূপ এখন পর্যন্ত খুঁড়ে

দেখা সম্ভব হয়নি। আশা করা যায় এই সব জায়গা খোঁড়া হলে অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৯ নম্বর

১। কেন আমাদের ইতিহাস পড়া উচিত? ২। কিভাবে প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস জানা যায়? (ছাঃ বৃঃ ৬২, ৬৩, ৬৪)

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। ইতিহাস বলতে কি বোঝায়?

২। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিভাবে ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে?

৩। মুদ্রা দিয়ে কিভাবে প্রাচীন যুগের কথা জানা যায়?

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) ইতিহাস বলতে সাধারণতঃ — — ক্রমবিকাশের কথা বুঝায়।

(খ) — — সে কালের রাজার নাম, শাসনকালের সন, তারিখ ইত্যাদি থেকে অনেক বিষয় বুঝতে পারা যায়।

(গ) প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান — —) দেশের লোকেরা নরম মাটির — — উপর তাদের কাহিনী লিখে রাখত।

মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। প্রত্নতত্ত্ববিদ কাদের বলা হয়?

২। প্যাপিরাস কি?

৩। আমাদের দেশের ধর্মগ্রন্থ কিসের উপর লেখা হয়েছিল?

অধ্যায়

২

প্রস্তর যুগের কথা॥

আদি মানব

মানুষের জন্ম ঃ সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হলো, তখন পৃথিবী ছিল সূর্যের মতই উত্তপ্ত। তাই তখন পৃথিবীতে কোন জীবের জন্ম সম্ভব ছিল না। ক্রমে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে থাকে—সৃষ্টি হয় উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি। মানুষ জন্মেছে অনেক পরে।

প্রথমে যে সব মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, তারা ছিল বানর জাতীর এক প্রকার জীব। এদের ইংরেজীতে বলা হয় এপ্ ম্যান (Ape man), বাংলায় কপি-মানব নাম দেওয়া যেতে পারে। এরাই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান মানুষের আকার পেয়েছে॥



অস্ত্র হাতে আদিম মানুষ

কতদিন আগে এই ধরনের মানুষের জন্ম হয়েছে তা বলা কঠিন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন পাঁচ লক্ষ বছর আগে এই জাতীয় মানুষ পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় বাস করত।

পিকিং-ম্যান ঃ ডব্লিউ সি-পেই ১৯২৯ সালে পিকিং থেকে মাত্র সাইত্রিশ মাইল দূরে চৌ-কৌ-তিয়েন গুহায়

এক রকম আদিম মানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পান। ঐতিহাসিকরা তাদের পিকিং মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। পিকিং মানুষের যে সকল অস্থি, দাঁত, মাথার খুলির অংশ ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা করে জানা যায় এগুলি পাঁচ লক্ষ থেকে দু লক্ষ বছরের পুরনো। তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, পিকিং মানুষের অস্তিত্ব তিন লক্ষ বছর ছিল। পিকিং মানুষ হাড় ও পাথর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। তারা আগুনের ব্যবহার জানত।



আদিম মানুষের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা

১৮৯১ সালে যবদ্বীপের **ট্রিনিস** নামক এক জায়গায় **ইউজিন দুব্যয়** নামে এক পণ্ডিত কয়েকটি দাঁত, উরুর হাড় ও মাথার খুলি আবিষ্কার করে প্রমাণ করেন

যে যবদ্বীপেও আদিম মানুষেরা পিকিং-মানবদের সমসাময়িক কালেই বাস করত। পণ্ডিতেরা এদের বলেন **যাভা মানব**।

প্রথম অবস্থায় মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। জীবজন্তুর মতই তারা শিকার করে কাঁচা মাংস খেত, বনে বনে গাছের ফল খুঁজে বেড়াত। মাটি খুঁড়ে নরম নরম গাছের শিকড় খেত।

আদিম যুগের মানুষের আশ্রয় বলতে ছিল পাহাড়ের গুহা ও গাছের কোটর। তাই এদের বলা হয় **গুহা মানব**। আগুনের ব্যবহার এরা জানত না।

আগুনের ব্যবহার ঃ আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার আগুন। জ্বালাতে শেখা। পণ্ডিতেরা মনে করেন যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন লক্ষ বছর আগে পিকিং মানুষেরাই প্রথম আগুন ব্যবহার করে। আগুনের ব্যবহার তাদের জীবনযাত্রায় আনে গভীর পরিবর্তন। তারা আগুনে মাছ, মাংস ইত্যাদি পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করে। শীত থেকে আত্মরক্ষা এবং অন্ধকার দূর করার জন্য আগুন হয়ে উঠে তাদের প্রধান সহায়। জীবজগতে একমাত্র মানুষই আগুন জ্বালাতে শেখায় অন্য সব জীবজন্তু তাকে ভয় পেতে শুরু করে। মানুষ বাসস্থানের সামনে আগুন জ্বালিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে।

আদিম মানুষদের জীবনে আগুনের মত হাতিয়ারও ছিল অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। আদিম যুগের এই হাতিয়ারগুলি পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা আদিম মানুষের ইতিহাসকে দুটি স্তরে ভাগ করেছেন। এই দুই স্তরেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি করেছে প্রধানতঃ পাথরে আর কখনো জীবজন্তুর হাড় বা গাছের ডালের সাহায্যে। পাথরই জীবনধারণের প্রধান উপকরণ হওয়ায় এই দুই স্তরকে যথাক্রমে **পুরা-প্রস্তর যুগ ও নব-প্রস্তর যুগ** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

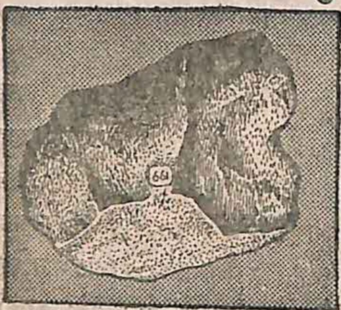
পুরা-প্রস্তর যুগের কথা

পুরা-প্রস্তর যুগের প্রথমদিকের হাতিয়ারগুলি ছিল অমসৃণ ও ভোঁতা পাথরের টুকরো। পরবর্তিকালে আদিম মানুষেরা এই হাতিয়ারগুলিকে আরো সুন্দর করে তৈরি করার চেষ্টা করে তাদের শিল্পী মনেরও পরিচয় দিয়েছিল।

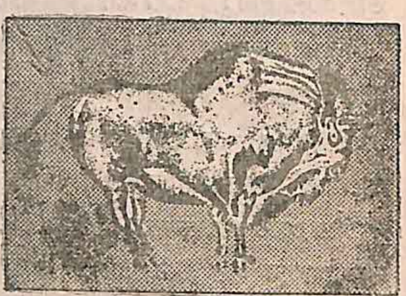
গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবির মধ্যেও আদিম মানুষের শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গুহার মুখ হতে অনেকখানি দূরে দেওয়ালের গায়ে অন্ধকারে কিভাবে এই সব ছবি আঁকা হয়েছিল তা ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। খুব সম্ভব শিল্পীরা চর্বি দিয়ে তৈরী দীপের আলোতে ছবি আঁকত। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ

স্পেনের **আলতামিরা** গুহায় নানা রঙে আঁকা বিরাট বাইসনের ছবিটির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে **সেনর মার্সেলিনো** নামে একজন স্পেনবাসী তাঁর খামারে এই গুহাটি হঠাৎ আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের বিভিন্ন গুহায় এরকম অনেক ছবি আবিষ্কৃত হয়।

হাতিয়ারের ব্যবহার ঃ পুরা-প্রস্তর যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রথম দিকে এ যুগের মানুষেরা তাদের হাতিয়ার কোন একটি বিশেষ কাজে ব্যবহার করত



পুরা-প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার (ভারত)



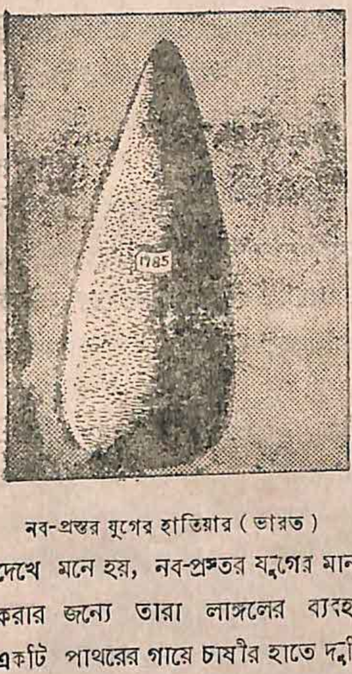
আলতামিরা গুহায় বাইসনের ছবি

না। একই হাতিয়ার নানা কাজে ব্যবহার করত। এছাড়া পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ ফসল উৎপন্ন করতে জানত না, তারা হাতিয়ার দিয়ে পশু বধ করত এবং বনের ফল-মূল সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করত।

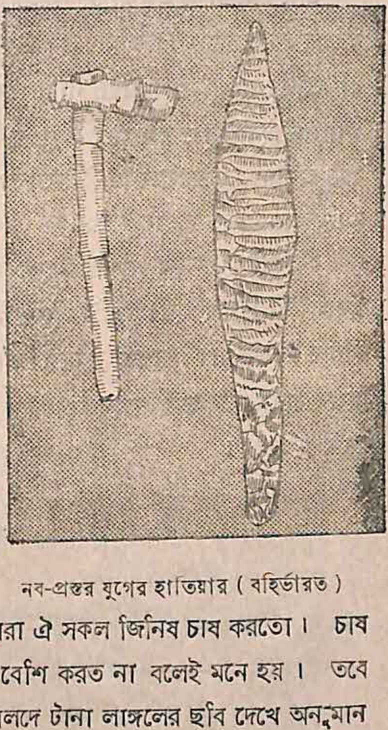
নব-প্রস্তর যুগের কথা

পুরা-প্রস্তর যুগর বেশ কয়েক লক্ষ বছর পরে শুরু হয় **নব-প্রস্তর যুগ**। পন্ডিতেরা মনে করেন, যীশুখৃীষ্টের জন্মের আট (কারো কারো মতে দশ থেকে বার) হাজার বছর আগে নব-প্রস্তর যুগ আরম্ভ হয়েছে। ভারত সহ পৃথিবীর সর্বত্র সে যুগের মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে পা য়া গিয়েছে। ভারতে মাদ্রাজের **বেলারি** জেলায় এই যুগের হাতিয়ার তৈরির একটি কারখানাও আবিষ্কৃত হয়েছে। পাথরের তৈরী এই হাতিয়ারগুলি বেশ মসৃণ ও ধারালো ছিল। তাছাড়া এগুলিতে হাতল লাগাবারও ব্যবস্থা ছিল। হাড়ের বা কাঠের লাঠির মাথায় হাতিয়ার লাগিয়ে তারা, তীর, বর্শা প্রভৃতি তৈরি করার কৌশলও আবিষ্কার করে। এই যুগের মানুষেরা সাঁড়াশি, কুড়াল, মই, ছেনি বাটালি, কাস্তে, করাত প্রভৃতি নানারকমের যন্ত্রপাতির ব্যবহার শেখে।

চাষ-বাসের সূচনা ঃ পুরা প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষা করেছিল। কিন্তু এই নব-প্রস্তর যুগের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে সভ্যতার পথে এগিয়েছিল। এই পথে এই যুগের মানুষের এক বিরাট আবিষ্কার কৃষিকার্য। এই যুগের মানুষেরা চাষবাস করতে শিখে। এই যুগের খাদ্যসন্ধানী মানুষ খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে পরিণত হয়। মাটির নীচে আবিষ্কৃত বার্লি, গম, ভুট্টা, রাই, নানারকম ফল, বাদামের টুকরো প্রভৃতি



নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার (ভারত)



নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার (বহির্ভারত)

দেখে মনে হয়, নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা ঐ সকল জিনিষ চাষ করতো। চাষ করার জন্যে তারা লাঙ্গলের ব্যবহার বেশি করত না বলেই মনে হয়। তবে একটি পাথরের গায়ে চাষীর হাতে দুটি বলদে টানা লাঙ্গলের ছবি দেখে অনুমান করা যায় যে, তারা লাঙ্গলের কথা জানত। এযুগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিড়ানি দিয়ে মাটি খুড়ে চাষবাস হতো। চাষের জন্যে বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর না করে তারা জলসেচের ব্যবস্থাও করেছিল বলে জানা গিয়েছে। কৃষির দ্বারা খাদ্য উৎপাদন মানুষকে আগেকার শিকার দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের বিপদ ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত করল। ফলে খাদ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ায় পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

পশুপালন ঃ এই যুগেই মানুষ বুনো পশুকে পোষ মানাতে ও তাদের দিয়ে

নানারকমের কাজ করিয়ে নিতেও শিখেছিল। বুনো নেকড়েকে তারা পরিণত করেছিল আত্মরক্ষার চিরসাথী কুকুরে। ছাগল, ভেড়া, শূকর, ষাঁড়, ঘোড়া ও গরুকে পোষ মানিয়ে পরিণত করেছিল গৃহপালিত পশুতে। তাদের দুধ আর মাংস যেমন তারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত, তেমনই তাদের চামড়া আর পশম দিয়ে তৈরি হতো থাকবার তাঁবু আর শরীর ঢাকবার পোশাক। আবার ষাঁড়, ঘোড়া প্রভৃতি পশুকে দিয়ে বোঝা টানান হতো।

মাটির বাসনপত্র ঃ মাটির বাসনপত্র তৈরির কৌশল আবিষ্কারও নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের জীবনে আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নরম মাটি রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে তারা নানা রকমের মাটির পাত্র তৈরি করত। ঈজিপ্ট, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলে সে যুগের কুমোরের চাক পাওয়া গেছে। এই চাকগুলি কাঠ অথবা পাথরের তৈরী। সম্ভবতঃ কুমোরের চাক পরবর্তিকালে গাড়ির চাকা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

বস্ত্রবয়ন ঃ নতুন প্রস্তর যুগে সুতাকাটা ও তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। এই যুগের মানুষ গাছের তন্তু দিয়ে সুতো প্রস্তুত করে তাঁতের দ্বারা কাপড় বুনতে আরম্ভ করে। বস্ত্রবয়নে নারীদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। বিভিন্ন গাছের রস দিয়ে অথবা কিছু ধাতব গুড়ো দিয়ে কাপড় রঙ করা হতো।



সুইজারল্যাণ্ডের হ্রদ-নিবাস

ঘরবাড়ি ঃ নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা চাষ করতে আরম্ভ করায় তাদের

যাযাবর জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই তারা তাদের জমির কাছেই দল বেঁধে বাড়িঘর তৈরি শুরু করে। এগুলি সাধারণতঃ মাটি, নলখাগড়া, কাঠ, পাথর প্রভৃতি দিয়েই তৈরি হতো। বুনো জন্তু-জানোয়ার বা অন্য গোষ্ঠীর লোকের আক্রমণের হাত থেকে এগুলি নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে বাড়িঘরের চারিদিকে চওড়া ও গভীর খাদ খোঁড়া হতো। আত্মরক্ষার জন্য নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা অগভীর হ্রদের জলেও খুঁটি পুঁতে তার ওপর ঘর তৈরি করত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ ও জেনিভা হ্রদের মধ্যে এরূপ বাড়ির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)।

গ্রামের উদ্ভব ও গোষ্ঠী-জীবনের সূচনা ঃ নতুন প্রস্তর যুগেই সমাজ-জীবনের সূচনা হয়। চাষ-আবাদের প্রয়োজনে নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ সাধারণতঃ নদীর তীরেই তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল। তারা নিজেদের তৈরী বাড়িতে বাস করত। মালপত্র আনানেওয়ার কাজ চলত তাদের পোষা গাধা বা ঘোড়ার সাহায্যে। তারা এখন আর যাযাবর নয়। এক সঙ্গে অনেক লোক এক জায়গায় বসবাস করার জন্য এক-একটা গ্রামের সৃষ্টি হয়। এই যুগে মানুষ ধীরে ধীরে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করত একজন প্রধান। প্রতি গোষ্ঠীর প্রধানদের নিয়ে একটি মিলিত সংগঠন থাকত। এই হলো রাজনৈতিক সংগঠনের প্রথম সূচনা।

যানবাহন ঃ নব-প্রস্তর যুগের মানুষেরা সাধারণতঃ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করলেও ঘোড়া, কাঠের শালতি বা ছোট ছোট নৌকাও ব্যবহার করতো। এরা স্লেজ গাড়ির মতো চাকাহীন এক রকমের গাড়িও ব্যবহার করতো।

ভাষার বিকাশ ঃ নব-প্রস্তর যুগের গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ হলেও এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের ফলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনও সহজ হয়ে উঠেছিল। মানুষেরা প্রথমদিকে কথা বলতে পারত না। তারা ইশারায়-ইঙ্গিতে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। ক্রমে ক্রমে তাদের কথা বলার বা বাক্‌শক্তির উদ্ভব ঘটে। এই বাক্‌শক্তিই বিকশিত হয়ে পরবর্তী কালে ভাষায় পরিণত হয় আর এক একটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক-একটি ভাষা।

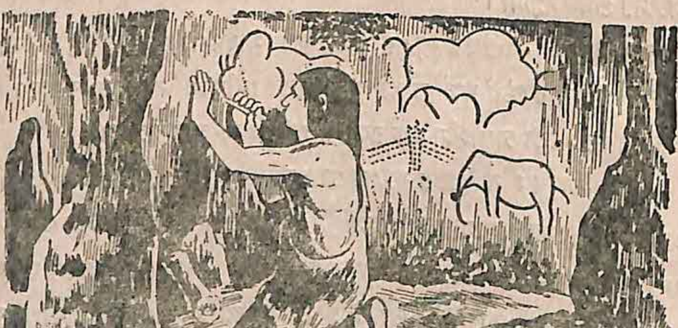
ধর্মবিশ্বাস ঃ আদিম যুগের মানুষ দিন-রাত্রির, ঝড়-বৃষ্টির, শীত-গ্রীষ্মের কারণ জানত না। তাই আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে, ঝড়-বৃষ্টি হলে তাদের ভয় হতো। আবার রাতে আলো দেখে তারা বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে থাকত। তারা

শিশুর মত ভয়ে, বিস্ময়ে, কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে দেখত। তারা বুঝত না হঠাৎ কেন ক্ষেতের শস্য শুকিয়ে যায়, নদীতে জল বেড়ে ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় ; তাই তারা ভাবত নদী, ক্ষেত ও আকাশের দেবতা আছেন। তাঁদের খুশী রাখতে পারলে বন্যা, ঝড়, বৃষ্টির ভয় থাকবে না, ক্ষেতের ফসলও নষ্ট হবে না। তাদের কাছে যা কিছু আশ্চর্য বা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে তারই পূজা করেছে। এই কারণে অনেক জায়গায় সূর্যের পূজোর প্রচলন করেছিল। গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবি থেকেও সেকালের মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানা যায়। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত বলে তাদের মৃত আত্মীয়ের কবরে শিকারের অস্ত্র, জলের পাত্র, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি রেখে দিত এবং স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করত। ডোলমেন নামে এক প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি থেকেই তা বোঝা যায়। এখনকার সভ্য মানুষ এই যুগের বংশধর।



ডোলমেন

শিল্পচেতনা : আদিম যুগের মানুষের বাসনপত্র, গুহার দেওয়াল বা পাথরে



পাথরের দেওয়ালে অঙ্কনরত পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ

আঁকা ছবি, পাথর খোদাই করা মূর্তি বা হাতিয়ারে আঁকা ছবি ইত্যাদি থেকেও তাদের শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

কালপঞ্জী

পুরা-প্রস্তর যুগের বিস্তৃতি—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০,০০০ অব্দ থেকে
৮,০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ।

নব-প্রস্তর যুগের " " " " ৮,০০০ অব্দ থেকে
৪,০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৯ নম্বর

১। আদিম যুগের মানুষদের জীবনযাত্রা ও হাতিয়ার সম্বন্ধে কি জান?
[৫+৪]

২। হাতিয়ার বলতে কি বোঝ? পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের হাতিয়ার সম্বন্ধে কি জান? [৬+৩]

৩। নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের হাতিয়ার সম্বন্ধে কি জান?

৪। নব-প্রস্তর যুগের মানুষের চাষবাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। পুরানো এবং নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় কি পার্থক্য দেখা যায়?

৬। নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের গোষ্ঠী-জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। নব-প্রস্তর যুগের ঘরবাড়ি সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। সভ্যতার জীবন যাপনের পথে আগুনের ব্যবহার এবং কৃষির আবিষ্কারের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৫+৪]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। পিকিং মানুষদের কথা কিভাবে জানা গিয়েছে?

২। অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রাচীন যুগের শিল্পীরা কি উপায়ে ছবি আঁকতেন?

৩। প্রা-প্রস্তর হাতিয়ারের সঙ্গে নব-প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের পার্থক্য কোথায় ?

৪। আদিম মানুষদের আগুনের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। নব-প্রস্তর যুগের মানুষদের ধর্ম-বিশ্বাসের কথা কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কোন্ গুহায় পিকিং মানবের হাড় পাওয়া গিয়েছে ?

২। কোন্ পণ্ডিত পিকিং মানবের হাড় আবিষ্কার করেছেন ?

৩। কোথায় যাভা মানুষের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে ?

৪। কোন্ যুগের মানুষেরা সর্বপ্রথম আগুনের ব্যবহার শেখে ?

৫। প্রস্তর যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

৬। যে যুগের পাথরের হাতিয়ারগুলি অমসৃণ ও ভোঁতা, সে যুগের নাম কি ?

মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। পিকিং ম্যান কাদের বলা হয় ?

২। আদিম মানুষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কি ?

৩। নব-প্রস্তর যুগে কি কি যানবাহন ছিল ?

৪। নব-প্রস্তর যুগের ঘরবাড়ি কেমন ছিল ?

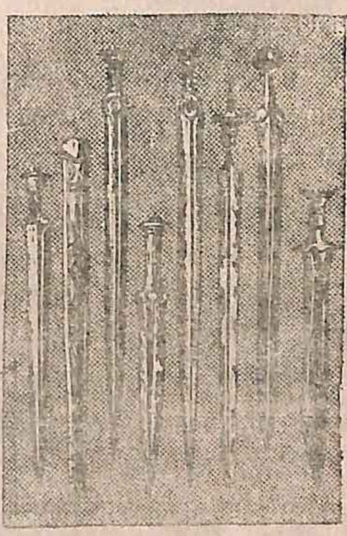
৫। কীভাবে ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল ?

অধ্যায়

৩ ধাতু যুগ

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের কথা

ধাতু যুগের সূচনা ঃ নব-প্রস্তর যুগের বেশ কয়েক হাজার বছর পরে শুরু হয় ধাতু যুগ। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধাতু যুগের সূচনা হয়েছিল তা নয়; যেদিন থেকে মানুষ তার প্রয়োজনে বিভিন্ন ধাতুকে আগুনে গলিয়ে তার ব্যবহার শুরু করে, সেদিন থেকেই ধাতু যুগের সূচনা হয়েছে। এই যুগের প্রথমে তামা, পরে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে এক সংকর ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। তবে পৃথিবীর সর্বত্রই যে তামার পরেই ব্রোঞ্জের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল তা নয়। কেননা ফিনল্যাণ্ড, উত্তর রাশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে তামার পরেই লোহার ব্যবহার শুরু হয়। যাই হোক, ধাতুবিদ্‌রা মনে করেন, আগুনে ধাতু গলানোর ব্যাপারটা হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়েছিল। সম্ভবতঃ পাথরের সঙ্গে মিশে থাকা তামাকে গলে যেতে দেখেই মানুষ তা দিয়ে নানা রকমের হাতিয়ার ও বাসনপত্র তৈরি করতে শেখে। এর ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাদিকে গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মানব সভ্যতার ব্যাপক উন্নতি ঘটে।


তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ার

নগরের উৎপত্তি ঃ সাগরের জলে যেমন প্রথম জীবনের সঞ্চার হয়, তেমনি সভ্যতার সূচনা হয় বড় বড় নদীর তীরে। নদীর দু'তীরের জমিতে

প্রচুর পরিমাণে পলি মাটি জমায় প্রচুর ফসল ফলে। সেচের জলের অভাবও হয় না। তদুপরি নদীপথে নৌকায় যাতায়াত সহজ হওয়ায় নদীর তীরে ছোট ছোট গ্রাম গড়ে উঠতে থাকে। গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়তে থাকায় ও চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ধারের উর্বর স্থানে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার বড় বড় নদীর ধারে নতুন নতুন জনপদ বিকাশ লাভ করে। ক্রমশঃ ছোট গ্রাম বড় হলো, বড় গ্রাম শহরে পরিণত হলো। এই যুগে গড়ে ওঠা শরহগুলির মধ্যে নীল নদের তীরে **মিশর,** টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে **উর, এরিডু, উরুক, আককাদ, নিনেভ, লাগাশ, নিপ্পুর, ব্যাবিলন,** সিন্ধু নদের তীরে **মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা** প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শহরগুলি ছিল নব-প্রস্তর যুগের গ্রামগুলিরই পরিবর্তিত রূপ।

উৎপাদন ঃ তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে এই সকল শহরের উৎপত্তির সঙ্গে নানা সমস্যারও উদ্ভব হয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখনকার মতো খাদ্য-সমস্যা। এই শহরগুলির লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে থাকায় আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন শুরু হয়। সেচের সুবিধা, উর্বর জমি আর অপেক্ষাকৃত উন্নত চাষের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতে থাকল। বাড়তি ফসল মানুষ মজুত করে রাখল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য এখন আর সকলকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হলো না। সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ জমি চাষ করা, বীজ বোনা, ফসল কাটা, সেচের জন্য খাল কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকল। টাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস, নীল নদ ও সিন্ধুনদের তীরে আবিষ্কৃত প্রাচীন খালগুলিই তাদের এই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এ ছাড়া, তারা যে সকল পশুপালন করত, তাদের মল-মূত্রকে সার হিসাবে ব্যবহার করে আরো বেশি পরিমাণে ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করেছিল।

বিভিন্ন পেশার উদ্ভব ঃ ইতিমধ্যে চাষের সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন, আত্মরক্ষার হাতিয়ার, বাসনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পেশার লোকেরা শহরে বাস করতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে কামার, কুমোর ছুতোর, তাঁত প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নব-প্রস্তর যুগে চাষীরাই সাধারণতঃ তাদের দরকারী জিনিসপত্র নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারত। কিন্তু ধাতুযুগে চাষের কাজে অধিক সময় কাটত বলে তাদের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম তৈরির ভার অন্য লোকদের উপর ন্যস্ত হয়। এভাবেই সমাজের

কৃষকের পাশাপাশি কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন পেশার লোকের উদ্ভব ঘটে। এক একটি কাজেই নিযুক্ত থাকতো বলে এরা নিজ নিজ পেশায় বেশ দক্ষ হয়ে উঠে। আর এইভাবেই সমাজে দক্ষ কারিগর ও শিল্পী-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য : তবে কারিগরেরা এইসব শিল্পদ্রব্য নিজেদের জন্যই তৈরি করত না। সাধারণতঃ নিজ নিজ পেশার বাইরের লোকদের জন্য এগুলি তৈরি হতো। তাই এই জিনিসগুলির বেচা-কেনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সে যুগে এখনকার মতো টাকা পয়সা দিয়ে কেনা বেচা চলতো না। লোকে **বিনিময় প্রথা** বা এক জিনিসের বিনিময়ে অন্য জিনিস দেওয়া-নেওয়া করে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। যেমন, চাষী তার শস্যের বদলে কামারের কাছ থেকে ধাতুর হাতিয়ার, বাসন, ছুতোরের কাছ থেকে নৌকা, গাড়ি, তাঁতীর কাছ থেকে কাপড়-চোপড়, কুমোরের কাছ থেকে মাটির বাসনপত্র সংগ্রহ করত। এভাবেই সে যুগের সমাজে এখনকার মতো ব্যবসায়িক লেনদেন চলতে থাকে।

ধাতুযুগে উৎপাদন পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সমাজ জীবনেও পরিবর্তনের সূচনা হয়। নব-প্রস্তর যুগে সাধারণতঃ নিড়ানির সাহায্যে চাষবাস হতো বলে পরিবারের মেয়েরাই সে কাজ করতে পারত। পুরুষেরা হাতিয়ার তৈরি আর শিকার করে দিন কাটাত। কিন্তু ধাতুযুগে লাঙ্গলের ব্যবহার খুব বেশি হওয়ায় চাষবাসের কাজ আর মেয়েদের দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠল না। এ কাজ পুরুষদেরই একচেটিয়া হয়ে দাঁড়াল। ফলে সমাজে পুরুষদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এভাবেই ধাতুযুগের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

সমাজ-জীবনে পরিবর্তন : খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস উৎপাদনের প্রণালীর পরিবর্তনের ফলে আদিম সমাজের রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আদিম সমাজ ছিল শ্রেণীহীন সমাজ। সকলে একসঙ্গে শিকার করত এবং ভাগ করে খেত। তাদের যা কিছু ছিল তা সকলের। এই যুগে পেশার ভিত্তিতে কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, সৈনিক, পশুপালক ছাড়াও ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এর একটি হলো প্রভু বা শাসকশ্রেণী, অপরটি হলো ভৃত্য বা শাসিত শ্রেণী। চাষের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসার ফলে সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সে যুগে সম্পদ বলতে বোঝাত গয়নাপত্র, কাপড়-চোপড়, চাষের সাজ-সরঞ্জাম, হাতিয়ার, গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর ইত্যাদি। এই সকল জিনিস, কেড়ে নেবার জন্যে এক গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর প্রায়ই লড়াই বেধে

যেত। এই লড়াইয়ে যে দল হেরে যেত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হতো না। বিজয়ীরা বিজিতদের গরু মোষের মত সংসারে বা সমাজের নানা কাজে নিয়োগ করত। এভাবে সমাজে বিজয়ীরা পেত প্রভু বা শাসকের মর্যাদা আর বিজিতরা ভৃত্য বা শাসিত বলে গণ্য হতো।

রাষ্ট্রের উদ্ভব ঃ সমাজে প্রভু ও দাস ছাড়াও জমিজমা ও অন্যান্য জিনিসপত্রে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হবার পর সমাজে এমন এক শ্রেণী দেখা দিল যারা খাওয়া পরার জন্য নিজেরা পরিশ্রম না করে অন্যের শ্রমের ফলভোগ করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারে। এর ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর উদ্ভব হলো। শ্রেণীভেদ দেখা দেওয়ায় এক শ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণীর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। তখন প্রয়োজন হলো শাসনব্যবস্থার। যারা বিত্তবান তারাই ছিল সমাজে শক্তিশালী অংশ। তারা শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা মনোনীত করে। রাজা দেশ শাসন করতে থাকে। এইভাবে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস প্রভৃতি দেশে প্রথম যুগের রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

কালপঞ্জী

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের বিস্তৃতি—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ থেকে খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৯ নম্বর

১। কবে থেকে ধাতুযুগের সূচনা হয়েছে?

২। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কি জান? [৫+৪]

৩। তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কি জান? [৫+৪]

৪। ধাতুযুগে সমাজ জীবনের পরিবর্তন সম্বন্ধে কি জান?

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে কি জান ? [৬+৩]

৬। কিভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে লিখ।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ কখন থেকে শুরু হয় ?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে নগরগুলো কোথায় গড়ে উঠেছিল ?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে উৎপাদন প্রণালীতে পরিবর্তন ঘটেছিল কেন ?

৪। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজে কিভাবে পেশার সৃষ্টি হয়েছিল ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে পাশের শূন্যস্থানে বসাও

(ক) — — বেশ কয়েক হাজার বছর পরে শুরু হয় ধাতু যুগ (নব-প্রস্তর-যুগের/পুরো-প্রস্তরযুগের)।

(খ) ধাতুযুগের প্রথমে তামা, পরে তামার সঙ্গে — (দস্তা/টিন) মিশিয়ে — (কাঁসা/ব্রোঞ্জ) নামে এক সংকর ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়।

(গ) প্রাচীন যুগে ব্যবসাবাণিজ্য চলত — (নগদ টাকার মাধ্যমে/পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে)।

(ঘ) — (গঙ্গা নদীর তীরে/সিন্ধু নদের তীরে) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতি শহরের নাম উল্লেখযোগ্য।

মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। ব্রোঞ্জ কি জাতীয় ধাতু ?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে গড়ে ওঠা দু-একটি শহরের নাম বল।

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিসের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত ?

৪। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজ কি মাতৃতান্ত্রিক না পিতৃতান্ত্রিক ছিল ?

৫। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সমাজ কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ?

অধ্যায়

৪

সভ্যতার আদিকেন্দ্র

(খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ—খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ)

মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালের মানুষেরা নদীর ধারেই তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু সকল নদীর তীরেই প্রাচীন যুগের মানুষদের সভ্যতা গড়ে উঠেনি। মাত্র কয়েকটি নদীর কাছেই তাদের এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। এই নদীগুলি হলো মিশরের নীলনদ, মেসোপোটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস, ভারতের সিন্ধুনদ ও চীনদেশের হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং। কয়েকটি বিশেষ কারণের জন্য এই সকল স্থানে মানুষের আদি সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়।

এই কারণগুলির মধ্যে প্রথমতঃ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলির উর্বর পলিমাটির কথা বলা যেতে পারে। এই সকল এলাকার পলিমাটি দিয়ে গড়া উর্বর মাটিতে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে ফসল ফলানো যেতো। তাছাড়া বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর না করে নদীর জলের সাহায্যে বারোমাসই প্রচুর ফসল ফলানো সম্ভব হতো।

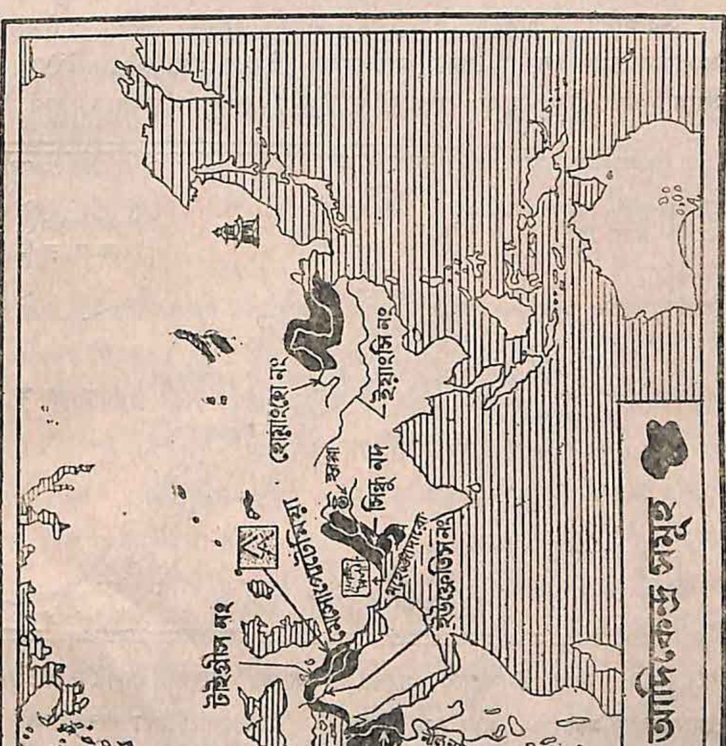
জলবায়ু ঃ দ্বিতীয়তঃ এই জায়গাগুলির জলবায়ুও নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ খুব গরমও নয়, আবার খুব ঠাণ্ডাও নয়। এই জলবায়ু শুধু যে ফসল উৎপাদনের উপযোগী তাই নয়, মানুষের বসতির পক্ষেও অনুকূল। তৃতীয়তঃ, প্রাচীনকালে মানুষের কাছে ফসল বোনার জন্য সময়ের হিসাব ছিল খুবই দরকারী। অথচ তাদের কোন ঘড়ি ছিল না। তাই তারা আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করে ফসল বুনতো। মিশর, মেসোপোটেমিয়া, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের আকাশ বছরের অধিকাংশ সময় পরিষ্কার থাকায়, প্রাচীনকালের মানুষেরা তাদের বসতি এই সকল স্থানেই স্থাপন করেছিল।

যাতায়াতের সুবিধা ঃ চতুর্থতঃ, তামা প্রভৃতি ভারী ধাতু দূর দূর দেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এই সকল ধাতু কম খরচে নিয়ে আসা এবং শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করার জন্যেও জলপথ বিশেষ উপযোগী ছিল।

পঞ্চমতঃ, নদীর তীরবর্তী অঞ্চল আত্মরক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী ছিল। বুনো জন্তু-জানোয়ার ও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নব-প্রস্তর যুগের

মানুষেরা খুঁটি পুঁতে মাচা তৈরি করে তার উপর বাস করতো। কিন্তু ধাতুযুগে মানুষেরা নদীর তীরে বসবাস করতে শুরু করে। কেননা ডাঙার দিকে খাদ খুঁড়ে বা পাঁচিল তুলে সহজেই শত্রুর মোকাবিলা করা যেতো।

পরিশেষে বলা যায়—নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস প্রভৃতি নদ-নদীর তীরবর্তী মাটি ঘরবাড়ি তৈরির খুব উপযোগী ছিল। মিশরে মাটি ও পাথর দিয়ে



সহজেই বাড়ি তৈরি করা যেতো। মেসোপোটেমিয়ার মাটি রোদে শুকনো করে নিলেই শক্ত ইঁট হয়ে যেতো। সিন্ধু অঞ্চলে এবং চীনেও বাড়িঘর তৈরির জন্য ইঁট ব্যবহৃত হতো।

এইভাবে দেখা যায়, উর্বর পলিমাটি, অফুরন্ত জল সরবরাহ, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, পরিস্কার আকাশ, যাতায়াতের সুবিধা ও ঘরবাড়ি তৈরির মাল-মশলার প্রাচুর্য প্রাচীন যুগের মানুষদের মেসোপোটেমিয়া, মিশর সিন্ধু অঞ্চল, চীন প্রভৃতি দেশে সভ্যতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল।

(ক) মেসোপোটেমিয়া

অবস্থান ঃ এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে পশ্চিমে দুটি বড় নদী আমাদের চোখে পড়ে। এদের একটি হলো ট্রাইগ্রিস, অপরটি হলো ইউফ্রেতিস। আর্মেনিয়ার উঁচু পাহাড় হতে এই দুটি নদী পাশাপাশি ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে



মেসোপটেমিয়া অঞ্চল

বয়ে গিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। এদেরই মধ্যবর্তী দেশটির প্রাচীন নাম **মেসোপোটেমিয়া** (বর্তমান নাম ইরাক)। মেসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। প্রাচীনকালে এই উপত্যকার নীচের অংশ ছিল ব্যাবিলোনিয়া নামে পরিচিত। এটি ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগের নাম ছিল **আক্কাদ**; আর দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল **সুমের**।

প্রাচীনত্ব ঃ মেসেপোটেমিয়া দেশটি মানব সভ্যতার এক অতি প্রাচীন জন্মভূমি। এখানকার সভ্যতাকে **সুমেরীয় সভ্যতাও** বলা হয়। এখন থেকে প্রায় সাড়ে ছ' হাজার বছর আগে এর সূচনা এবং এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখানকার মাটি খুঁড়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম এই সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন, এবং সেগুলির উপর ভিত্তি করেই এর সম্পর্কে অনেক কথাই জানা সম্ভব হয়েছে।

ভূমির উর্বরতা ও উৎপন্ন শস্য ঃ প্রাচীনকালে ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মোহনায় ছিল নিচু জলাভূমি। ক্রমে পলিমাটি জমে জমে এই জলাভূমি হয়ে উঠে উঁচু আর খুবই উর্বর। খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে পাওয়া এক তথ্য থেকে জানা যায় যে' এখানে প্রচুর পরিমাণে বার্লি চাষ করা হতো। বার্লি ছাড়া এখানে ভুট্টা ও গমের চাষ হতো। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি বলেছেন—এখানে বছরে দুবার গমের চাষ হতো। এই গম কেটে নেবার পর যে খড় থাকত, তা পশুখাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যেত।

অধিবাসী ঃ এই সকল লোভনীয় খাদ্যে আকৃষ্ট হয়ে উত্তরের পাহাড় অঞ্চল থেকে সবচেয়ে আগে আসে **সুমেরীয়রা**। এদের গায়ের রং ছিল লাল আর নাক ছিল টিকালো। এরা দাড়ি, গোঁফ এবং অনেক সময় মাথার চুলও কামিয়ে ফেলত।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর নির্মাণ ঃ যাহোক, এরাই টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের বন্যার জল নিকাশের জন্য খাল কেটে চাষের জমি তৈরি করে। শুধু তাই নয়, বন্যা প্রতিরোধের জন্য তৈরি করে বড় বড় বাঁধ। এভাবেই দেশটিকে বসবাসের উপযোগী করে তোলে। আর গড়ে তোলে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট বড় নানা রকমের শহর। এই শহর গুলির মধ্যে **উর, এরিদু, আক্‌দাদ নিপ্পুর, লাগাশ, কিশ, নিনেভ, ব্যাবিলন** প্রভৃতি প্রধান শহর। মেসোপোটেমিয়ায় পাথর পাওয়া যেতো না, তাই মাটি দিয়ে ইঁট তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে এরা বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির, বন্দর তৈরি করত। এগুলির দেওয়ালও তারা পোড়ামাটির কারুকার্য দিয়ে সাজাত। শহরগুলির প্রত্যেকটি ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

বিভিন্ন উপজীবিকা ঃ কৃষি ছিল প্রধান উপজীবিকা। কৃষকরা বলদ টানা লাঙল দিয়ে জমি চাষ করত। ধাতুনির্মিত যন্ত্র তখনও দুস্প্রাপ্য ও অত্যন্ত দামী বলে পাথর ও মাটির তৈরি কাস্তে দিয়ে ফসল কাটত এবং এক ধরনের কাঠের ঝাড়াই যন্ত্রে শস্য আলাদা করে নিত। কৃষি ছাড়াও সুমেরীয়রা পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছাগল গরু গাধা প্রভৃতি ছিল প্রধান। তাছাড়া অনেকে সুতো ও পশমের কাপড় বুনে তাদের জীবিকা অর্জন করত। তাদের তৈরি কাপড়ে কারুকার্য ও রংয়ের বৈচিত্র ছিল প্রসিদ্ধ। আবার কেউ কেউ চাষীদের চাষের সাজ সরঞ্জাম তৈরী করেও সংসার চালাত।

ধাতু বিদ্যা ঃ সুমের অঞ্চলে 'আর' নামে এক নগরের কবরের মধ্যে সোনা

ও রূপোর পাত্র, গহনা, রূপোর বীণা, সোনার তৈরি মুকুট পাওয়া গিয়াছে। এ থেকে বোঝা যায় সেকালে সুমেরীয় স্যাকরারা ধাতু নিষ্কাসন বিদ্যায় খুবই পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন ঃ সুমেরবাসীরা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপোর নানা প্রকার শৌখিন শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। শুধু যে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে সুমেরবাসীদের প্রচুর অর্থ আয় হতো তা নয়, তারা উপযুক্ত শস্য রপ্তানি করেও বিদেশ থেকে নানারকমের জিনিসপত্র আমদানি করত। এই আমদানি-রপ্তানিকে কেন্দ্র করেই মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠে। এরা জলপথে পালতোলা নৌকা ও স্থলপথে মরু ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তামা, টিন সোনা, পাথর, রূপো, কাঠ বিদেশ থেকে আনতে হতো। হয়ত মিশর ও সিন্ধু নদের তীরবর্তী নগর গুলির সঙ্গে সুমেরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।



সুমেরদের আবিষ্কৃত রথ

সুমেরীয় দেব-দেবী ঃ সুমেরবাসীরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এরা চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতিকে দেবতা মনে করে তাদের অর্চনা করত। এই সকল দেব-দেবীর জন্য সুমেরীয়রা শহরের মাঝখানে ইঁট দিয়ে বিরাট বিরাট মন্দির তৈরি করত। তখনকার সুমেরীয় ভাষায় এগুলিকে বলা হতো জিগ্‌গুরাত ; জিগ্‌গুরাতগুলির মধ্যে উরুক শহরে আবিষ্কৃত পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু জিগ্‌গুরাতটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জিগ্‌গুরাতটি আনু নামে এক দেবতার উদ্দেশে তৈরি হয়েছিল। জিগ্‌গুরাতটির সামনে রয়েছে ২৪৫ ফুট লম্বা ও ১০০ ফুট চওড়া ইন্‌নানা দেবীর বিরাট আকারের মন্দির। এই মন্দিরগুলিতে পূজা-অর্চনার জন্য পুরোহিত নিয়োগ করা হতো।

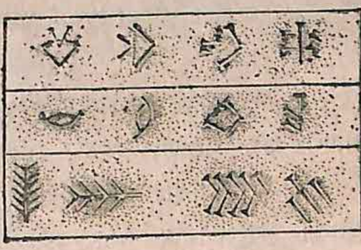


জিগ গুরাত

এইসব পুরোহিত আর রাজপুরুষেরা নিজেদের দেবতার প্রতিনিধি হিসাবে দেশ শাসন করতো। পুরোহিতদের জ্যোতিষ শাস্ত্রেও ছিল গভীর জ্ঞান। তারা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলতে পারত।

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের বিকাশ: সুমেরীয়দের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প ছিল উন্নতমানের। তারা ইট দিয়ে বিশাল উঁচু বাড়ি ও মন্দির তৈরি করত। তখনকার ইট বেশ বড় আকারের ছিল। সমতল ভূমিতে পাথর খুবই কম পাওয়া যেত। তা সত্ত্বেও পাথরের তৈরি ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাথরের তৈরি বন্য পশু ও কদাকার জন্তু এবং মানুষের মাথার আকৃতি সহ যাঁর সেকালের শিল্প-রীতির পরিচয় বহন করে। সুমেরীয়রা পাথরের নানারকম কাজে খুব দক্ষ ছিল। নরম মাটির প্রশস্ত ফলকের উপর ছাপ দেওয়ার উপযোগী সুন্দর মোহর তারা পাথর কেটে তৈরি করতে জানত। একে এক ধরণের মুদ্রাঙ্কন বলা হয়। একটি মোহরের উপর একজন পুরুষ ও মহিলার মূর্তি অঙ্কিত আছে, সম্ভবত এরা কোন দেবদেবী। কারুকার্যমণ্ডিত এই সব জিনিস দেখে সেকালের শিল্পীদের শিল্পজ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

সুমেরীয় লিপি: সুমেরীয়রা ক্রমে এক ধরণের সাংকেতিক লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। একে বলা হয় লিপি বা অক্ষর। এই লেখা আগে ছিল চিত্রলেখা বা তার ছবি। কিন্তু শুধু ছবি দিয়ে সব বোঝানো সম্ভব নয়। তাই ছবির বদলে সুমেরীয়রা কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন সৃষ্টি করে। নরম মাটির টালি তৈরি করে তার উপর নলখাগড়া বা কাঠির কলম দিয়ে আঁচড় কেটে এই অক্ষরগুলি লেখা হতো। পরে এই টালিগুলিকে রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হতো। এই লেখা গুলি দেখতে ছিল ধনুকের তীরের মুখের মতো। ল্যাটিন ভাষায় একে বলা হয় **কুনিয়াস**। তাই সুমেরীয়দের লিপিগুলি **কুনিফর্ম** লিপি নামে পরিচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এরূপ অনেক মাটির টালি পাওয়া গিয়াছে। সুমেরীয়দের এই উন্নত লেখার পদ্ধতি মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃত। এই টালিগুলিতে রাজ্যশাসনের



কুনিফর্ম লিপি

কথা, নানা প্রকার দলিল, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বহু বিষয়ের কথা আছে।

মেসোপোটেমিয়ার উত্তরাঞ্চল আরব দেশ হতে আগত আক্‌দাদ জাতির বাসভূমি ছিল। সুমের জাতির সঙ্গে আক্‌দাদ জাতির দীর্ঘকাল ধরে বিরোধ চলে। তাছাড়া সুমের ও আক্‌দাদের ছোট ছোট খন্ড রাজ্যের মধ্যেও বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। ফলে সর্বত্র অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার সুযোগে ব্যাবিলন রাজ্য সুমের ও আক্‌দাদ অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করে। সুমেরীয় শহরগুলোর পতন ঘটলেও এই অঞ্চলে সুমেরীয়দের ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রভাব বহুকাল পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।

কালপঞ্জী

মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা (৫০০ খৃীষ্ট পূঃ—১৫০০ খৃীষ্ট পূঃ)

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * **৯ নম্বর**

১। সভ্যতার প্রথম বিকাশ কোন কোন দেশে হয়েছিল ?

২। মেসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ কি ? এই অঞ্চল কোথায় অবস্থিত ? [৩ + ৬]

৩। সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ কোথায় হয়েছিল ? প্লাবনের হাত থেকে তারা কি ভাবে আত্মরক্ষা করত ? [৫ + ৪]

৪। সুমেরীয়রা কি ভাবে নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল ? তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শহরের নাম বল ? সুমেরীয়দের জীবন যাপন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা কর। [২ + ২ + ৫]

৫। মেসোপোটেমিয়ার লিপিমালার বৈশিষ্ট্য কি ? এই লিপিকে ক্যুনিফর্ম লিপি বলে কেন ? [৪ + ৫]

৬। সুমেরীয়দের অর্থনৈতিক জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। সুমেরীয়দের ধর্ম ও শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। সুমেরের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমরা কেমন করে জানতে পারি ?

২। সুমেরবাসীরা বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ?

৩। সুমেরবাসীরা চাষবাসের কাজ কেমন করে করত ?

৪। সুমেরবাসীদের প্রধান প্রধান জীবিকা সম্পর্কে কি জান ?

৫। পুরোহিতদের ক্ষমতা কেমন ছিল ?

৬। সুমেরের প্রধান যানবাহন ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে কি জান ?

৭। সুমেরদের লিখন পদ্ধতি কেমন ছিল ? কুনিফর্ম লিপি সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) মেসোপোটেমিয়া শব্দের অর্থ হলো —।

(খ) মেসোপোটেমিয়ার উত্তর ভাগের নাম — আর দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল —।

(গ) সুমেরদের মন্দিরকে বলা হত — —।

(ঘ) সুমেরীয়দের লিপিগুলি — — লিপি নামে পরিচিত।

মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। মেসোপোটেমিয়ার বর্তমান নাম কি ?

২। মেসোপোটেমিয়া কোন কোন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ?

৩। সুমেরীয়রা দেখতে কেমন ছিল ?

৪। সুমেরীয়দের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল ?

৫। জিগগুরাত কাকে বলে ?

(খ) মিশর ঃ

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বে নীলনদের তীরে মিশর দেশটি প্রাচীন সভ্যতার আর এক পীঠস্থান। ইংরেজীতে এই দেশকে বলে ঈজিপ্ট।

অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি ঃ এই দেশের মাঝখান দিয়ে নীলনদ বয়ে গিয়ে উত্তরে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। এদেশের দু'ধারে পাহাড় আর পাহাড়ের পিছনে দু'দিকেই সীমাহীন মরুভূমি। পশ্চিমের বিশাল মরুভূমির নাম **সাহারা**। এই সাহারা মরুভূমি থাকায় জলবায়ু সাধারণতঃ শুষ্ক ও উষ্ণ। তাই এখানে বৃষ্টি একেবারে হয় না বললেই চলে। কিন্তু নীলনদের জলপ্লাবন মরুভূমির সম্ভাবনাকে দূর করে দিয়ে এ দেশটিকে উর্বরা করে রেখেছে। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি ও বরফ গলা জলে নীলনদ কানায় কানায় ভরে ওঠে, উপত্যকায় বন্যার সৃষ্টি করে, আর পলিমাটি দিয়ে উপত্যকাকে উর্বর করে তোলে। তাই এখানে অল্প পরিশ্রমে বছরে প্রচুর পরিমাণে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা যায়। এইজন্যই মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়। নীলনদের জলপথে দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজে করা যায়। গৃহনির্মাণের উপযোগী পাথর এবং বিভিন্ন ধরনের ধাতু এদেশের পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দু-ধারে পাহাড় ও মরুভূমি দিয়ে ঘেরা থাকার ফলে, এদেশে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনাও কম। মিশরের এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান তাকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত করেছে।

মিশর দেশের সভ্যতা কিন্তু কোন একটি বিশেষ জাতির দ্বারা গড়ে উঠেনি। জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনে পলিমাটি দিয়ে গড়া নীলনদের উপত্যকায় বহু জাতি বসবাস আরম্ভ করে। তাদের পরস্পরের মিলনের ফলে গড়ে ওঠে মিশরের পৃথিবীখ্যাত অতুলনীয় সভ্যতা।

প্রথমে মিশর অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের ছিল পৃথক পৃথক শাসনকর্তা, প্রধান শহর, নিজস্ব উপাস্য দেবতা ও বিশেষ কোন প্রতীক বা চিহ্ন। চাষবাস করা ও গরু-ভেড়া চরানো ছিল এদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এরা বুঝতে পারলো যে, এভাবে আলাদা থেকে লাভ নেই! একসঙ্গে কাজ করে নীলনদের বন্যা প্রতিরোধ করা দরকার। তাছাড়া পরবর্তী চাষের জন্য এই বন্যার জলকে ধরে রাখারও প্রয়োজন। তাই ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকেরা একত্র হয়ে বড় বড় বাঁধ তৈরি করে এবং খাল কেটে এই সমস্যার সমাধান করে। এদের এই পরস্পর মিলনের ফলে মিশরের বিভিন্ন

রাজ্য এক হয়ে গিয়ে উত্তর রাজ্য ও দক্ষিণ রাজ্য—এই দুইটি রাজ্যের সৃষ্টি হয়। আরও পরে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে এই দুইটি রাজ্য এক হয়ে বৃহৎ মিশর রাজ্য গড়ে উঠে।

ফ্যারাও ঃ তিন হাজার বছর ধরে এই সংযুক্ত মিশর রাজ্যে ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ পর পর রাজত্ব করে। এখানকার রাজাদের উপাধি ছিল **'ফ্যারাও'**। 'ফ্যারাও' শব্দটির আসল মানে কিন্তু রাজা নয়, রাজবাড়ী। কিন্তু প্রজাদের মুখ দিয়ে রাজার পবিত্র নামটি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য রাজাকে বোঝাতে ফ্যারাও শব্দের প্রচলন হয়। সংযুক্ত মিশরের প্রথম ফ্যারাও ছিলেন **মেনেস**। তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ মিশরীয় ইতিহাসের রাজবংশগুলির মধ্যে প্রথম রাজবংশ। প্রথমদিকে কায়রোর নিকটবর্তী **মেম্‌ফিস্‌** নগরী ছিল মিশরের রাজধানী। কিন্তু পরবর্তী যুগে শক্তিমান ফ্যারাওগণ দক্ষিণ মিশরের **থিব্‌স্‌** নগরীকে তাঁদের রাজধানী করেন। দ্বাদশ বংশের ফ্যারাওদের সময় মিশর খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁদের রাজত্বকালে দেশ সমৃদ্ধশালী হয়, দূর দূর দেশের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা সম্ভাব স্থাপিত হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় মন্দির এবং অন্যান্য সৌধ নির্মাণ করেছিলেন।


তৃতীয় থুটমোস

এরপর মিশরে দীর্ঘদিন গৃহবিবাদ ও অরাজকতা চলে। সেই সুযোগে এশিয়া থেকে **'হিক্‌সস্‌'** বা 'মেষপালক রাজগণ' নামে এক জাতি এসে মিশর অধিকার করে এবং দীর্ঘদিন রাজত্ব করে। এরা মিশরে ঘোড়া ও রথের প্রচলন করে। এই বিদেশী শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ক্রমে মিশরীয়রা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠে। অষ্টাদশ বংশের প্রথম ফ্যারাও এদের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন। এই রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফ্যারাও ছিলেন **তৃতীয় থুটমোস**। এঁকে বলা হয় মিশরের **'নেপোলিয়ন'**।

রাজকর্মচারী ঃ মিশরের রাজার অধীনে বহু রাজকর্মচারী ছিল। কৃষি, রাজস্ব, সেচ, বিচার ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের জন্য এক এক জন প্রধান কর্মচারী থাকতেন।

প্রতি প্রদেশে থাকতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। তাঁরা খাজনা আদায় করতেন। প্রজারা খাজনা দিত গরু, বাছুর, ফসল বা অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে। কারণ এখনকার মত টাকা পয়সা তো তখন ছিল না। খাজনা জমা দিতে হতো মেমফিসে অবস্থিত বিশাল শস্যাগারে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা আবার প্রদেশের সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন। স্থানীয় দেবতাদের পূজার ভারও তাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল।

এছাড়া আর এক শ্রেণীর রাজ-কর্মচারী ছিল তাদের কেরাণী বলা যায়। এদের কাজ ছিল খাজনা আদায় আর খরচপত্রের হিসাব ও শাসনবিষয়ের নানা জিনিস লিখে রাখা। তারা লিখত প্যাপিরাসের উপর।

সৈন্য ও শ্রমিক ঃ মিশরের রাজার অস্ত্রাগার ছিল, সেনাপতি ছিল, ছিল সৈন্যবাহিনী। চাষী, কারিগর, দাস এবং প্রয়োজনে সকলেই যোদ্ধা। রাজার আদেশে সকলকেই যুদ্ধে যেতে হতো। চাষী দিন রাত খেটে ফসল উৎপাদন করত, কারিগর হাতিয়ার তৈরি করত। দাস শ্রম দান করত প্রাসাদ, মন্দির তৈরির কাজে। আবার প্রয়োজনমত তারাই যুদ্ধ করত। যারা চাষী ও মজুর, তারাই সৈন্য আবার যারা সৈন্য তারাই উৎপাদনে সাহায্য করত। সৈনিকরা সিনাই উপদ্বীপের তাম্রখনি হতে তামা সংগ্রহ করে আনত।

পুরোহিত ঃ সমাজে সবচেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলে বিবেচিত হতেন



আসিরিসের মূর্তি



কারনাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

পুরোহিতেরা। তাদের কাজ ছিল দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করা, লোকদের ধর্মবিষয় উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি। দেবদেবীরা অসন্তুষ্ট হলে মহাঅনর্থ ঘটবে এই ভয়ে সকলে পুরোহিতদের খুব সমীহ করে চলত। তা ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার সব রকম দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল পুরোহিতদের উপরে। মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন বিদ্যালয়ে ছেলেরা

নিয়মিত শিক্ষালাভ করত। তাই সকলের উপরেই ছিল পুরোহিতদের প্রবল প্রতাপ। এমনকি ফ্যারাওরা সময় সময় শাসন বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ দিতেন।

দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাস ঃ মিশরবাসীরা বহুদেবদেবীর পূজা করত। অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে এরাও দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এইসব দেবদেবীর আকৃতি ছিল মানুষের কিন্তু মুখ ছিল পশুপাখীর মত। বাজমুখো **হোরা**, কুকুরমুখো **'অসিরিস্'**, সিংহমুখো **সেখেট** প্রভৃতি হলেন মিশরের দেবতা। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্য দেবতা 'রে', থিবস্ নগরের দেবতা **'অ্যামন'** এবং নীলনদ ও পরলোকের দেবতা 'অসিরিস্'। অ্যামন দেবতার উদ্দেশ্যে মিশরীয়রা অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর মন্দিরটি 'কারনাকের' মন্দির নামে পরিচিত।

লিখন প্রণালী ঃ মিশরের মন্দির এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক প্রচীনলিপি পাওয়া গিয়েছে। এইসব লেখা থেকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস জানা যায়। মিশরের প্রাচীন লিপি অনেকটা ছবির মত। পাথরের উপর এই ধরনের লেখাকে ইংরাজীতে **হায়ারোগ্লিফিক** বলে। বাংলায় একে চিত্রলিপি বলা হয়। পাথরের উপর যা লেখা হতো তা রাজারাজড়াদের কীর্তি। অন্য লোক লেখবার জন্য প্যাপিরাস ব্যবহার করত। এই প্যাপিরাস থেকে ইংরাজী পেপার শব্দ এসেছে। মিশরের জলা-



হায়ারোগ্লিফিক লিপি

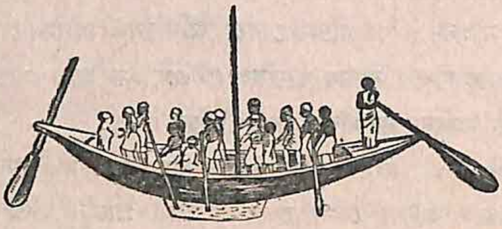
ভূমিতে নল-খাগড়ার মত এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। তাকে ছোট করে কেটে চাপ দিয়ে প্যাপিরাস তৈরি হতো। তার উপর খাগের কলম দিয়ে লেখা হতো। বহুদিন পর্যন্ত এই লিপি পাঠ করতে কেউ সক্ষম হয়নি। কিন্তু রোসেটা নামক একটি পাথরে একই বিষয় 'হায়ারোগ্লিফিক', গ্রীক ও অন্য একটি অক্ষরমালায় লেখা ছিল। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিশর আক্রমণ করেন তখন তাঁর সৈন্যরা নীলনদের মোহানায় রোসেটা



রোসেটার শিলালিপি

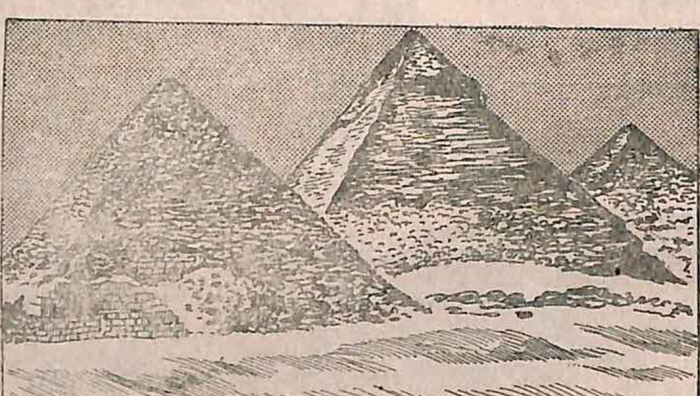
এলাকায় এক দুর্গ তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে শুরু করে এবং তারই ফলে এই পাথরটি আবিষ্কৃত হয়। যে স্থানে পাথরটি পাওয়া গিয়েছে, তারই নাম অনুসারে এই পাথরটির নাম দেওয়া হয়েছে **'রোসেটা পাথর'**। **'শাঁপোলিয়াঁ'** নামে এক ফরাসী পণ্ডিত দীর্ঘ কুড়ি বছরের চেষ্টার পর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীকলিপির সাহায্যে ঐ পাথরের লিপি পড়তে সক্ষম হন।

শিল্প ও বাণিজ্য ঃ প্রাচীন মিশরীয় কারিগররা খুব বেশী কুশলী ছিল। তারা



কাঠের নৌকা

মাটি, তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে নানা প্রকারের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। মণিকাররা অলংকার, কুমাররা বাসনপত্র, ছুতোররা নৌকো, স্থপতিরা



পিরামিড

পাথরের মূর্তি ও সমাধি মন্দির, চর্মকাররা চামড়ার জিনিস কামারেরা বাটালি, ছুচ, কাস্তে, বর্শা প্রভৃতি তৈরি করে মিশরের অর্থনৈতিক জীবন উন্নত করে। প্রথমদিকে কারিগররা তাদের তৈরি জিনিসপত্রের বিনিময়ে খাদ্য ও শস্য ক্রয় করত।

আরও পরে মুদ্রার প্রচলন হয়। এইভাবে মিশরে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু নীলনদের ধারেই গড়ে ওঠেনি। সেকালে মিশরীয়রা সমুদ্রগামী বড় বড় নৌকা ও জাহাজও তৈরি করে। তার সাহায্যে তারা লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

পিরামিড ঃ মিশরীয় সংস্কৃতিতে পিরামিড এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। তাই মিশর **'পিরামিডের দেশ'** বলেও পরিচিত। মিশরের রাজা বা ফ্যারাওদের সমাধি মন্দিরকে **পিরামিড** বলা হয়। পিরামিডগুলি দেখতে পাহাড়ের চূড়ার মতো। বড় বড় পাথর থাকে থাকে গেঁথে এগুলি তৈরি করা হতো। পিরামিডগুলির মধ্যে গিজের তিনটি পিরামিড সবচেয়ে বড়ো। এগুলি প্রায় ৫০০০ বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সবচেয়ে বড় পিরামিডটি ৪৮১ ফুট উঁচু। এটি তৈরী করেছিলেন চতুর্থ রাজবংশের প্রথম ফ্যারাও খুফু। এই পিরামিডটিতে আড়াই লক্ষ পাথরের চাঁই ব্যবহৃত হয়েছিল, এদের গড় ওজন ছিল আড়াই টন। এইগুলির স্থাপত্য কার্য আজও বিস্ময় জাগায়।



ম্যমি

ম্যমি ঃ মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মা মৃতদেহের মধ্যেই বাস করে। দেহ রক্ষা না করলে আত্মা মরে যাবে কিংবা ভূত হয়ে বিপদের সৃষ্টি করবে। এই বিশ্বাসে মিশরবাসীরা মৃতদেহ চিরকাল রক্ষা করার জন্য প্রথমে একপ্রকার তেল মাখিয়ে, তারপর নানারকম আঠা মাখানো সূক্ষ্ম কাপড় মৃতদেহে জড়িয়ে দিত। একে ম্যমি বলা হতো পরে সেটিকে কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা হতো। এতে মৃতদেহ নষ্ট হতো না। তাই হাজার হাজার বছরের পুরানো মিশরীয়দের মৃতদেহ আজও দেখা যায়। ৪০ বছর আগে **টুটেন খামেন** নামে এক ফ্যারাও-এর

কবর খুঁড়ে অনেক রকমের সুন্দর কারুকার্য মণ্ডিত কাঠের, পাথরের এবং ব্রোঞ্জের মূর্তি, মানচিত্র, আসবাব-পত্র, পালঙ্ক, রাজ-পোশাক, সোনার গয়না প্রভৃতি বহু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গিয়েছে।



কবরের মধ্যে প্রাপ্ত কারুকার্যমণ্ডিত পাত্র ও মূর্তি

উপজীবিকা ঃ মিশরবাসীরা কাঠের, পাথরের, হাতীর দাঁতের এবং ব্রোঞ্জের কাজেও খুব দক্ষ ছিল। তারা তাঁত শিল্পেও যথেষ্ট উন্নত ছিল, মাটি ও চামড়া প্রভৃতির জিনিস খুব সুন্দরভাবে তৈরি হতো। বিভিন্ন রকমের রং দিয়ে এগুলিকে আরও সুন্দর করে তোলা হতো। সোনা, হীরা ও মণি-মুক্তার গহনাও তৈরি হতো। কাঁচের ও রঙীন কাঁচের জিনিসপত্র তৈরির কৌশল তারাই প্রথম আবিষ্কার করে। মিশরের প্রাচীন চিত্র থেকে মিশরবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।



তাঁতে কাপড় বোনা হচ্ছে

পৃথিবীর ইতিহাসে মিশরের অবদান অতুলনীয়। মরুভূমি ও সমুদ্র দিয়ে ঘেরা থাকায় বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে মিশরীয়রা নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। একই কারণে খুব কম দেশই এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সিরিয়া, ক্রীট, গ্রীস প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র মাত্র মিশরীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। গ্রীকগণ ক্রীটবাসীদের মাধ্যমে মিশরীয়দের গ্রহণ করে এবং তাকে আরও উন্নত করে।

কালপঞ্জী

পিরামিড যুগ—খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০—২৫০০

ফ্যারাও খুফু—খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৯৮—৩০৭৫

মিশরের হিকসস্ আধিপত্য—খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০—১৬০০

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * **৯ নম্বর**

১। মিশরকে কেন নীলনদের দান বলা হয় ?

২। প্রাচীন মিশরীয়রা কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করত ?

৩। তাদের সমাজে পুরোহিতরা কি মর্যাদার অধিকারী ছিল ?

৪। মিশরের প্রাচীন লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে তোমার ধারণা লিপিবদ্ধ কর।

৬। মিশরকে কেন পিরামিডের দেশ বলা হয় ? যে কোন একটি পিরামিডের বর্ণনা দাও।

৭। প্রাচীন মিশরের শাসকদের কি উপাধি ছিল ? তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * **৩ নম্বর**

১। মিশরের প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থান কেন তাকে পৃথিবীর সভ্যতার পীঠস্থানে পরিণত করেছে ?

২। রোসেটা পাথর কখন কিভাবে আবিষ্কৃত হয় ?

৩। প্রাচীন মিশরবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। মিশরবাসীর জীবিকা সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * **১ নম্বর**

এক কথায় উত্তর দাও :

১। মিশরের পশ্চিমের বিশাল মরুভূমির নাম কি ?

২। মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন ?

৩। প্রাচীন মিশরের রাজাদের উপাধি কি ?

৪। সংযুক্ত মিশরের প্রথম রাজার নাম কি ?

৫। কাকে মিশরের 'নেপোলিয়ান' বলা হয় ?

৬। প্রাচীন মিশরের লেখককে কি বলা হয় ?

৭। ইংরেজীতে 'পেপার' শব্দটি কোন্ কথা থেকে এসেছে ?

৮। মিশরে এক প্রকার তেল মাখিয়ে মৃতদেহ অবিকৃত রাখার পদ্ধতিকে কি বলা হয় ?

৯। মিশরের প্রাচীন লিপিকে কি বলে ? ডান দিকে '√' চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :—

কুনিফর্ম □ হায়ারোগ্লিফিক □ ব্রাহ্মী □

মৌখিক প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

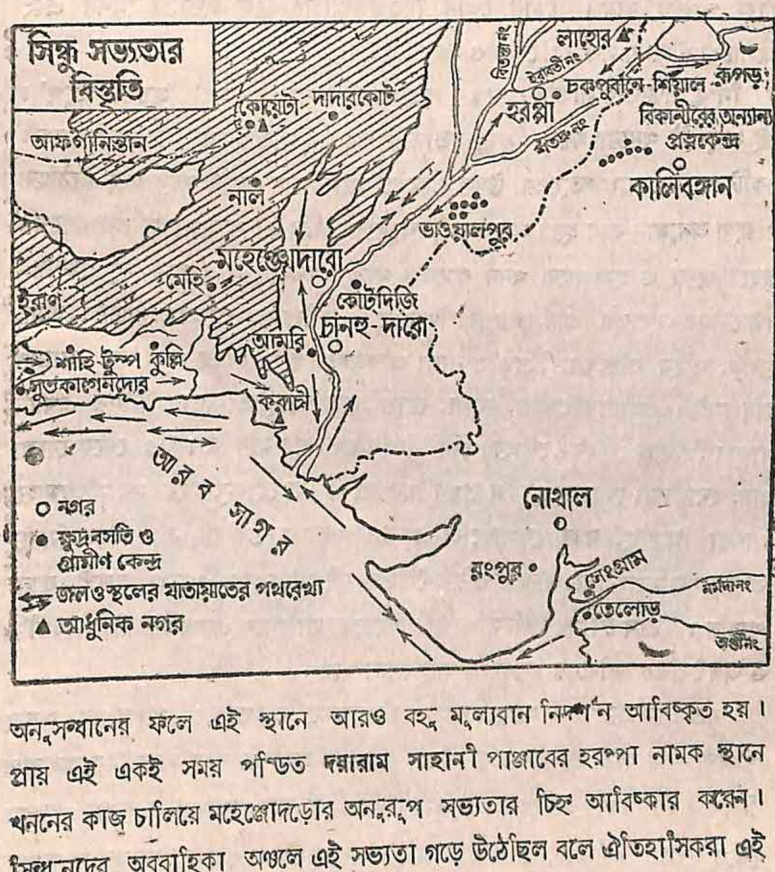
১। ফ্যারাও কাদের বলে ?

২। হায়ারোগ্লিফিক লিপি কারা ব্যবহার করত ?

৩। পিরামিডের দেশ বলতে কোন্ দেশকে বুঝায় ?

(গ) সিন্ধু-সভ্যতা

অতি প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে যেমন নদীর ধারে ধারে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষেও ঠিক তেমনি সিন্ধুনদের তীরে এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে ওঠে। সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের হরপ্পায় মাটির তলা থেকে এই সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখন এ দুটি জায়গাই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের সবখানি গৌরব যাঁর, তিনি একজন প্রখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক। তাঁর নাম **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের



অনুসন্ধানের ফলে এই স্থানে আরও বহু মূল্যবান নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। প্রায় এই একই সময় পণ্ডিত **দয়ারাম সাহানী** পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে খননের কাজ চালিয়ে মহেঞ্জোদড়োর অনুরূপ সভ্যতার চিহ্ন আবিষ্কার করেন। সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতার নামকরণ করেছেন **সিন্ধু-সভ্যতা**।

এতকাল ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল যে আর্যদের আগমনের সময় থেকে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস শুরু হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার নিদর্শন-গুলি পরীক্ষা করে পন্ডিতগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এখন থেকে প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে (অর্থাৎ ৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ) সিন্ধু সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল এবং সম্ভবতঃ ১৫০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

সমসাময়িক মেসোপোটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার সাথে এর কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কোন কোন বিষয়ে আবার এই সভ্যতা মিশর এবং মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা থেকেও উন্নত ছিল।

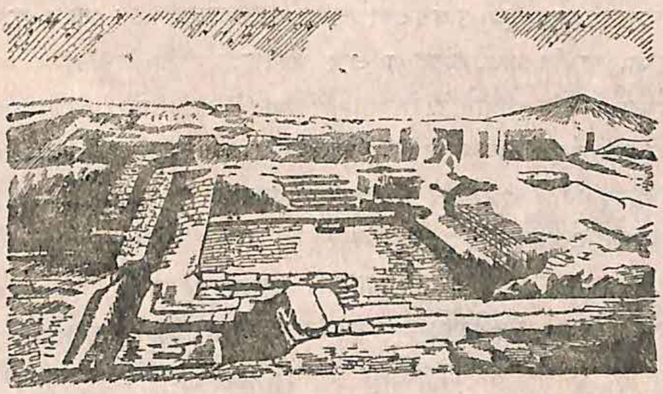
সিন্ধু সভ্যতার সাতটি স্তর ঃ মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ '**মৃতের স্তূপ**'। এই স্তূপটি খননের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার পর পর সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। একটি শহরের ধ্বংসস্তূপের উপর পরবর্তিকালে আর একটি শহর গড়ে উঠেছিল এইরূপ অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের বন্যা এই ধ্বংসের অন্যতম কারণ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে খনন কার্যের ফলে অনেকগুলি (প্রায় দু হাজার) সীলমোহর ও ধাতুর জিনিস পাওয়া গিয়েছে। সীলমোহরগুলিতে গন্ডার, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, ষাঁড়, হাতী প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর ছবি আছে। কিন্তু ঘোড়ার ছবি নাই। আবার সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা প্রভৃতি ধাতুর জিনিস এখানে পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু লোহার কোন জিনিস পাওয়া যায় নি। এ থেকে বোঝা যায়, ঘোড়া বা লোহার প্রচলন তখন ছিল না। যা হোক্, যে সব সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, তার লেখাগুলি আজও পড়া সম্ভব হয়নি। ফলে সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয় ও রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানা যায়নি। তবে যে সব জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনের অনেক কথাই জানা যায়।

বর্তমানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক কালে খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। গুজরাটের রংপুর, লোথাল প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গেছে ভাঙ্গা বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্নানের ঘর, নর্দমা। পাঞ্জাবের রূপার অঞ্চলে মাটির নানারকমের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। রাজস্থানের কালিবঙ্গানেও সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে।

নগর পরিকল্পনা ঃ সিন্ধু-সভ্যতা ছিল শহরকেন্দ্রিক। শহর বিন্যাস ও নির্মাণে সে যুগের লোকেরা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল, তা সত্যিই বিস্ময়কর। নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই শহরগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুটি শহরের সীমানা ছিল তিন মাইলেরও বেশী। শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও বেশ চওড়া। সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটি ছিল চৌত্রিশ ফুট। এই রাস্তাগুলি পরিষ্কার রাখার জন্য পাশে পাশে আবর্জনা ফেলার পাত্র থাকত। জল নিকাশের জন্য রাস্তার ধারে পাকা নর্দমাও ছিল। এগুলি আবার টালি দিয়ে ঢাকা থাকত। রাত্রে রাস্তায় আলো দেবারও ব্যবস্থা ছিল। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে কূপ খনন করা হয়েছিল।

ঘরবাড়ি ঃ রাস্তাগুলির দু-পাশে ছিল পোড়া ইঁটের তৈরি ছোট-বড় অসংখ্য বাড়ি। কোন কোন বাড়ি দোতলা তিনতলা ছিল এবং উপরে উঠবার সিঁড়িও ছিল। প্রায় প্রতি বাড়িতেই কুয়া, স্নানের ঘর, পায়খানা ও জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। নদীর বন্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য বাড়ির ভিত উঁচু



মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

করা হতো। বসবাস করার জন্য অসংখ্য ঘর ছাড়াও বড় বড় কয়েকটি অট্টালিকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদড়োতে একটি অট্টালিকার একটি ঘর ছিল বহু স্তম্ভবিশিষ্ট।

হরপ্পার প্রতিরক্ষার জন্য খুব উঁচু একটি পাঁচিলের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে।

মহেঞ্জোদড়োতে ইঁটের তৈরি বিরাট এক চৌবাচ্চা ছিল। এই চৌবাচ্চার দু'দিকে জলে নামার জন্য সিঁড়ি ছিল। নিকটবর্তী সরোবর থেকে কৃত্রিম উপায়ে জল এনে এটি পরিপূর্ণ রাখা হতো। আবার মধ্যে মধ্যে ময়লা জল বের করে দিয়ে এটিকে পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থাও ছিল। এর চারপাশে ছোট ছোট স্নানের ঘর ও বসার ব্যবস্থাও ছিল। এখানে হামাম বা গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র স্নানাগারটির দৈর্ঘ্য ৫৫ মিটার ও প্রস্থ ৩৩ মিটার এবং এর বাইরের দেওয়ালটি ২৪ মিটার চওড়া ছিল।

শস্যাগার: সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম বিস্ময় ছিল এর বিভিন্ন শস্যাগার। এগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে, এখানে বহুদিন পর্যন্ত শস্য সংরক্ষিত রাখার জন্য বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ছিল।

সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও যব। এছাড়া তরমুজ, খেজুর প্রভৃতি ফল, মাছ, ভেড়া ও শূকরের মাংস এবং দুধ খাদ্য হিসাবে এদের খুব পছন্দ ছিল। সিন্ধুর অধিবাসীরা তুলা ও পশমের পোশাক ব্যবহার করত। এরা দেহের নিম্নাংশের জন্য এক প্রস্থ এবং উপরের অংশের জন্য আর এক প্রস্থ কাপড় ব্যবহার করত। পুরুষেরা দাড়ি রাখত কিন্তু গোঁফ কামাত। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মাথায় লম্বা চুল রাখত এবং গয়না পরতে ভালবাসত। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত, বহুমূল্য এবং অল্পমূল্য পাথর দিয়ে এইসব গয়না তৈরি হতো। এই গয়নাগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট ছিল। স্ত্রীলোকেরা আধুনিক কালের মত নানা রকম খোঁপায় নিজেদের সাজাত। তারা হাতীর দাঁতের চিরুনি, সুর্মা, ঠোঁট রং করবার পালিশ প্রভৃতি প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করত।

বাসন-পত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র: মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, তখনকার লোকেরা সোনা, রূপা, সীসা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুশিল্পে খুব উন্নত ছিল। কিন্তু লোহার ব্যবহার এদের অজ্ঞাত ছিল কারণ, লোহার কোন জিনিস এখানে পাওয়া যায় নি। চীনামাটি, ব্রোঞ্জ, তামা ও রূপার তৈরি থালা, বাটি ঘটি, কলসী প্রভৃতি বাসনপত্র, মাছ ধরার ছিপ ও নানা রকমের জিনিস তারা ব্যবহার করত। এ ছাড়া মাটি ও ব্রোঞ্জের তৈরি ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি খেলনা দেখে মনে হয় যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই জিনিসগুলি ব্যবহার হতো। যন্ত্রপাতি নির্মাণে তামা অপেক্ষা ব্রোঞ্জের ব্যবহারই বেশী হতো। আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ব্রোঞ্জের একখানি দাঁতওয়ালা ছোট করাত।

সিন্ধুদেশের লোকেরা তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী তীর-ধনুক, বর্শা, ছোরা, গদা, কুড়ুল প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। তবে পাথরের তৈরি অস্ত্রেরও প্রচলন ছিল। আত্মরক্ষার জন্য এরা দুর্গও নির্মাণ করত।

কৃষি ও শিল্প ঃ সিন্ধু-অঞ্চলের অধিবাসীরা চাষবাস, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করত। তবে কৃষিই ছিল এদের প্রধান উপ-জীবিকা। গম, যব ও তুলার চাষ হতো বেশী। তুলার আঁশ থেকে কাপড় তৈরি করার পদ্ধতি এদের জানা ছিল। এদের শিল্পসৃষ্টি ছিল অতি সুন্দর। মাটির



সিন্ধু-সভ্যতার নানাবিধ মূর্তি ও অলংকার

কাজ ও ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুনির্মিত মূর্তি ও সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন নক্‌শার অলংকার শিল্পীদের উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করে। মাটির তৈরি পাত্র-গুলি হলুদ বা লাল রং করা হতো। মাটির পাত্র ছাড়া, মাটি দিয়ে মানুষ, গরু,



মাটির পাত্র



মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহর

হাতী, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর, মুরগী প্রভৃতি শিশুদের নানাবিধ খেলনা তৈরি হতো। সীলমোহরগুলির উপর নিখুঁতভাবে খোদাই করা মানুষ ও পশুর মূর্তিগুলির মধ্যে শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পাতে এমন

কতকগুলি পাথরের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি গঠন-নৈপুণ্যে প্রাচীন গ্রীসের শিল্পকলার সঙ্গে তুলনীয়। খুব সুন্দরভাবে খোদাই করা এক ধরনের 'চিত্র লিপির' সীলমোহরও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এর পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তবে মেসোপোটেমিয়া ও ক্রীটের প্রাচীন লিপির সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

বাণিজ্য ঃ সিন্ধু অধিবাসীরা বাণিজ্যে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। জলপথে এবং স্থলপথে এরা ভারতের এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। মালপত্র বহন ও যাতায়াতের জন্য গরুর গাড়ীই প্রধান যান হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তবে সীলমোহরে আঁকা নৌকার ছবি দেখে অনুমান করা যায়, এরা নৌকাও ব্যবহার করত। ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া, ক্রীট, পারস্য, মিশর, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে এদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এরা বিদেশের বাজার থেকে টিন, তামা ও মূল্যবান পাথর প্রভৃতি আমদানি করত এবং এদেশের তৈরি জিনিস বিদেশে রপ্তানি করত। সীলমোহরগুলি সম্ভবতঃ মালপত্র কেনাবেচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

ধর্ম ঃ সিন্ধু-সভ্যতার শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে কোন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাই বলে যে দেবদেবীর পূজা হতো না তা নয়। মাটির তলায় পাওয়া একটি সীলমোহরে ধ্যানরত এক দেবতার মূর্তি দেখা যায়। এঁর তিনটি মুখ, মাথায় দুটি শিং ও চারদিকে পশুর মূর্তি আঁকা আছে। এটি পশুপতি শিবের আদি মূর্তি বলেই মনে হয়। শিবের উপাসনার সাথে সাথে সিন্ধুবাসীরা স্ত্রীদেবতারও পূজা করত, কারণ পোড়ামাটির তৈরি বহু স্ত্রীদেবতার মূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও সে যুগের মানুষ গাছপালা, জল, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান হিন্দুধর্মের যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটাই তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, সিন্ধু-সভ্যতা পরবর্তীকালের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।



পশুপতি শিবের মূর্তি

সমাজে শ্রেণীবিভাগঃ সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে তৎকালীন সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের কিছু আভাষ পাওয়া যায়। মেসোপোটেমিয়া ও মিশরীয় সভ্যতার মত সিন্ধু-সভ্যতায় ও সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কোন রাজা অথবা ক্ষুদ্র পুরোহিতশ্রেণীর হস্তে। হরপ্পা নগরের কেন্দ্রে সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এর সঙ্গে সংলগ্ন রয়েছে বিরাট শস্যাগার। নগরে দ্বিতলবিশিষ্ট পোড়া ইঁটের প্রশস্ত বাড়ি রয়েছে। বাড়িগুলি দেখতে ঠিক প্রাসাদের মতই। এর মধ্যে রয়েছে সব রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। রান্না ঘর, স্নানের ঘর, সুন্দর জলনিকাশের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই ছিল বাড়িগুলিতে। খনন কার্যের ফলে এই বড় বড় বাড়িগুলি থেকেই পাওয়া গেছে সুন্দর পাত্র, মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি। বাড়ির বাসিন্দারা ছিল প্রকৃতই ধনী। কারিগরদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের থাকতে হতো শহরের উপকন্ঠে। তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল ব্যারাকের মত বাড়িগুলিতে। অনেক ছোট ছোট ঘর নিয়ে বিশাল লম্বা বাড়ি—তার মধ্যে থাকতে হতো একসঙ্গে অনেককে। এসব বাড়িতে বসবাসের সুযোগ-সুবিধা খুবই কম ছিল। শিল্প-কর্মে নিপুণ কারিগররা এমন জীবনই যাপন করত।

সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের কারণঃ এই সভ্যতা কি করে যে ধ্বংস হয়ে গেল তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। পন্ডিতগণ অনুমান করেন যে ২০০০-১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা বিনষ্ট হয়। সিন্ধু-অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত-ভাবে পড়ে থাকা বহু মৃতদেহ দেখে মনে হয়, ভূমিকম্প বা অনুরূপ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই শহরটি ধ্বংস হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও যাযাবর আর্যজাতির আক্রমণের ফলে এই সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

অনুশীলনী

* * *

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার ও তার অবস্থিতি বর্ণনা কর। [৪+৫]

২। সিন্ধু-সভ্যতার নগর জীবন সম্বন্ধে কি জান?

৩। সিন্ধু-অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য ও পোশাক সম্বন্ধে যা জান লেখ। [৪+৫]

৪। সিন্ধু-অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকা সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ?

৫। সিন্ধু-উপত্যকার ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে কি জান ?

৬। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন হতে এই সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ কি ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। সিন্ধু সভ্যতা কিভাবে আবিষ্কৃত হয় ?

২। মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ স্নানাগার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৪। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। সিন্ধু-সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কারের অবদান আছে এমন চার জনের নামের পাশে √ চিহ্ন দাও ঃ

শ্যাম্পলিয়াঁ	□	হেরোডোটাস	□
মেগাস্থিনিস	□	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	□
দয়ারাম সাহানী	□	স্যার জন মার্শাল	□
কাশীরাম দীক্ষিত	□	ননী গোপাল মজুমদার	□
মার্টিমার হুইলার	□		

২। সঠিক উত্তরটির পাশে '√' চিহ্ন দাও ঃ

(ক) সিন্ধু-সভ্যতা কি ধরনের সভ্যতা ? গ্রামভিত্তিক ; নগরভিত্তিক।

(খ) ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা—সিন্ধুসভ্যতা, বৈদিক আর্য সভ্যতা।

— —

(ঘ) চীনদেশ

প্রাচীন সভ্যতার আর এক পীঠস্থান হলো চীন। মেসোপোটেমিয়া এবং মিশরে নীলনদের তীরে যেমন প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি প্রায় চার হাজার বছর আগে (২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) চীনদেশেও দুটি বড় নদীর ধারে এক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই নদী দুটির মধ্যে একটির নাম হোয়াংহো বা পীত নদী, অন্যটির নাম ইয়াং সিকিয়াং। এই দুটি নদীর মাঝখানে বিস্তীর্ণ উর্বর সমতলভূমি ছিল চীনাদের আদি বাসস্থান। চীনের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে হিমালয় আর পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়, পর্বত এবং মালভূমি। প্রাচীন চীনের রূপকথা বা কাহিনীগুলো অনেকটা প্রায় আমাদের দেশের প্রাচীন উপাখ্যানগুলির মতো।

চীনের রূপকথা ঃ আমাদের দেশের পৌরাণিক উপাখ্যানে মনুকে প্রথম মানুষ বলা হয়। তাঁর জন্ম হয় মহাপ্রলয়ের মধ্য থেকে। চীনা উপাখ্যান অনুযায়ী তাদের দেশের প্রথম মানুষ পান্-কু! চীনাদের উপকথাতে আছে, পান্-কু আঠার হাজার বছর বেঁচেছিলেন এবং তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। মৃত্যুর পর তাঁর দেহের মাংস থেকে মাটি, হাড় থেকে পর্বত, চুল ও লোম থেকে গাছপালা, মাথার খুলি থেকে আকাশ, এক চোখ হতে সূর্য এবং আর এক চোখ হতে চন্দ্রের সৃষ্টি হয়। চীনারা মনে করতো, তাঁর চোখের জলেই হোয়াংহো এবং ইয়াং-সিকিয়াং নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় তিনিই আকাশ ও পৃথিবীকে নূতন রূপ দিয়েছিলেন।

চীনের উপাখ্যানে পর পর পাঁচ জন রাজার কাহিনী আছে। দেশের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তারা একজন রাজা ঠিক করে নেয়। রাজাকে তারা বলতো "ঈশ্বরের পুত্র" এবং তাঁকে আন্তরিক সম্মানও করত, এবং প্রথম রাজা ফুসি খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৫২ অব্দে চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শরীরটা দেখতে ছিল সাপের মতো। ইনি নিজের রানীর সহায়তায় চীনাদের ঘরবাড়ি তৈরি, পশুপালন, মাছ-ধরা, লোহার হাতিয়ার দিয়ে শিকার, বিবাহ এবং রান্না করতে ও লিখতে শিখিয়েছিলেন। ফুসি সংগীত ও চিত্রলিপি (ছবির সাহায্যে লেখা) প্রচলন করেন। এই সময় চীনে গুটিপোকার চাষ থেকে রেশম সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। চীনের দ্বিতীয় রাজা সেন নাং-এর মাথাটা ছিল

মানুষের কিন্তু দেহটা ছিল ষাঁড়ের। ইনি চীনে কৃষিব্যবস্থা আর কাঠে তৈরি লাঙ্গলেরও প্রচলন করেন। চীনের তৃতীয় রাজা হুয়াংটি ছিলেন মানুষের মতো দেখতে। চীনা রূপকথায় তাঁকে বলা হয় পীতরাজা। চীনারা এঁকে তাদের আদি পুরুষ বলে মনে করে। এই সময়েই চীনে সভ্যতার বিকাশ বিশেষভাবে ঘটে। ইনিই চীনে চুম্বক, চাকা, ইট দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া দিন, মাস, বছর, প্রভৃতি গণনা করার জন্য তিনি দিন পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারের সংস্কার সাধন করেন ও একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। চীনের চতুর্থ রাজা ইয়াও তাঁর ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর রাজপ্রাসাদের বাইরে সিংহ দরজায় একটি ঢাক রেখে দিয়েছিলেন। এটি বাজিয়ে প্রজারা বিচার প্রার্থনা করতে পারতো। চীনের পঞ্চম রাজা ছিলেন শান্। ইনি হোয়াংহো নদীর বন্যা রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, মালপত্রের ওজন ঠিক রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন ও দিনপঞ্জীর আরো সংস্কার সাধন করেন। কথিত আছে, ইনি বৃদ্ধ বয়সে য়ু নামে এক বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ারকে নিজের সিংহাসনের পাশে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

চীনা রূপকথায় বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ঃ এই 'য়ু' পরে হিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চীন রূপকথা অনুযায়ী জানা যায় 'য়ু' হোয়াংহো নদীর বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চীনারা চাষবাস দ্বারা তাদের জীবিকা অর্জন করতো। কিন্তু হোয়াংহো নদীর বন্যায় প্রায়ই তাদের ফসল, ঘরবাড়ি নষ্ট হতো ও মানুষ মারা যেত। এইভাবে হোয়াংহো নদী চীনের গভীর দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই চীনারা ঐ নদীকে দুঃখের নদী বলে অভিহিত করেছিল। 'য়ু', দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নয়টি পর্বত কেটে নয়টি হ্রদ তৈরি করে, নয়টি নদীর বন্যা রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, ড্রাগন ও কচ্ছপও তাঁকে এই হ্রদ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। তিনি বন-জঙ্গল কেটে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষবাসের ব্যবস্থা করেন।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৯ নম্বর

১। চীনদেশের রূপকথা থেকে পৃথিবী সৃষ্টির কাহিনী কিভাবে জানা যায়?

২। প্রাচীন চীনের রাজাদের সম্পর্কে কি জান?

৩। প্রাচীন চীনের রাজারা কিভাবে এই দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেছিলেন ?

৪। কেন হোয়াংহো নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয় ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন * * * ৩ নম্বর

১। চীনের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে কি জান ?

২। চীনদেশের প্রথম মানুষ সম্পর্কে কি জান ?

৩। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। চীনের পঞ্চম রাজা কে ছিলেন ? তাহার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন * * * ১ নম্বর

১। চীনদেশের প্রথম মানুষ কে ?

২। প্রাচীন চীনারা রাজাকে কি বলতো ?

৩। চীনদেশের প্রথম রাজার নাম কি ?

৪। কাকে চীনের দুঃখ বলা হয় ?

৫। পৌরাণিক মতে কোন্ চীন সম্রাট কৃষিকার্যের প্রবর্তন করেন ?

৬। কোন্ সম্রাট হোয়াংহো নদীর বন্যানিয়ন্ত্রণ করেন ?

৮। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে ' √' চিহ্ন দাও।

(ক) লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—সম্রাট ফুসি, সেননাং, হুয়াংটি।

(খ) চীনের প্রথম মানুষ পান-কু [হ্যাঁ, না]।

---

(৬) নদীমাতৃক সভ্যতাসমূহের বৈশিষ্ট্য

মেসোপোটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা, চীন প্রভৃতি স্থানের নদীর তীরবর্তী সভ্যতাগুলির কথা গভীরভাবে আলোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ, এই সভ্যতাগুলি কৃষির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। যদিও সমাজে কৃষক ছাড়া আরও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোক ছিল, তথাপি কৃষকরাই ছিল সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস, সিন্ধু, হোয়াং-হো এবং ইয়াং-সিকিয়াং প্রভৃতি নদ-নদী থেকে কাটা খাল এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বড় বড় বাঁধ নির্মাণের প্রচেষ্টাও কৃষির প্রতি তাদের গভীর আগ্রহের পরিচয় দেয়।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ঃ দ্বিতীয়তঃ নদীমাতৃক এই সভ্যতাগুলি ছিল নগরকেন্দ্রিক। অর্থাৎ সুপরিকল্পিত শহরকে কেন্দ্র করেই এগুলি গড়ে উঠেছিল সব ক্ষেত্রে না হলেও অন্ততঃ মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইট-পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িঘর, সুন্দর সুন্দর মন্দির, জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত, শস্য রাখার ঘর, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা নগরজীবনের অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

শ্রেণীবিভাগ ঃ তৃতীয়তঃ, নদীর তীরবর্তী এই সভ্যতাগুলির অন্য যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলো জীবিকা বা পেশার ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ। এইচ, জি, ওয়েলস্ নামে এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক প্রাচীন এই সভ্যতাগুলির অধিবাসীদের মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—সরকারী কর্মচারী, কৃষক, বণিক, শিল্পী ও পশুপালক।

দেবদেবীর উপাসনা ঃ চতুর্থতঃ, দেবদেবীর উপাসনা ছিল আদি সভ্যতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সকল সভ্যতার অধিবাসীরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এছাড়া তারা গাছপালা, পাথর প্রকৃতিকেও পূজা করত। সাধারণ মানুষের উপর পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল অপরিসীম কেননা সমাজে পূজা-অর্চনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই কারণেই মিশর, মেসোপোটেমিয়ায় এক শক্তিশালী পুরোহিতশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

লিপি ঃ পঞ্চমতঃ, এই সকল নদীমাতৃক সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল লিপির আবিষ্কার। প্রথমদিকে লিপি বলতে কিছু ছিল না। ঐ সময় মালপত্র, সম্পত্তি ইত্যাদিতে চিহ্ন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। পরে ঐ চিহ্নগুলি লিপি বা অক্ষরে পরিণত হয়। এই লিপি আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মেসোপোটেমিয়ার অধিবাসীরা ক্যুনিফর্ম লিপি উদ্ভাবন করে। এর পরে মিশরীয়রা আবিষ্কার করে হাইরোগ্লিফিক্ লিপি, আর চীনারা আবিষ্কার করে চিত্রলিপি বা ছবির সাহায্যে লেখার পদ্ধতি। এদিক দিয়ে মিশর ও চীনা লিপির মধ্যে কিছুটা মিল দেখা যায়। লিপি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরাও পিছিয়ে ছিল না। তারা যে লিপি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল ঐ অঞ্চলের সীলমোহরগুলিই তার সুন্দর প্রমাণ। অন্যান্য সকল লিপি পড়া সম্ভব হলেও সিন্ধু অঞ্চলের লিপিগুলি আজও পড়া সম্ভব হয়নি।

রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় ঃ ষষ্ঠতঃ, মিশর, মেসোপোটেমিয়া সিন্ধ চীন প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়েছিল। তারা বড় বড় রাজ্য গঠন করে শাসনের সুবন্দোবস্ত এবং ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র স্থাপন করে সমাজে রাজার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথেও অগ্রসর হয়েছিল। এই রাজারা ঈশ্বরের পুত্র ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করে সমাজে নিজেদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি স্থাপনেও সচেষ্ট হয়েছিল। সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে মিশর মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেন দেখে অনুমান করা যায় যে, তারাও উন্নত এবং যুগোচিত এই রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলি কৃষিভিত্তিক হলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে সেগুলি একেবারে অজ্ঞ ছিল না। কৃষির সঙ্গে সে যুগের মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যকেও অন্যতম এক জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

কালপঞ্জী

আনুমানিক	খ্রীষ্টপূর্ব	৪৫০০ অব্দ	মেসোপোটেমিয়ার	সভ্যতার	বিকাশ	কাল।
"	"	৪০০০ "	মিশরের	"	"	"
"	"	৩২৫০ "	সিন্ধু	"	"	"
"	"	২৮৫২ "	চীনা	"	"	"

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। নদীমাতৃক সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। লিপির আবিষ্কার কিভাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

৩। নদী উপত্যকার সভ্যতাগুলির সমাজ ব্যবস্থায় কি কি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। 'নদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতাগুলি ছিল নগরকেন্দ্রিক'—ব্যাখ্যা কর।

২। নদীমাতৃক প্রাচীন সভ্যতাগুলির ধর্ম জীবনের পরিচয় দাও।

———

অধ্যায়

৫

লৌহযুগের সমাজের কথা

ধাতুযুগের ইতিহাসে লোহার আবিষ্কার নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে কিভাবে লোহা আবিষ্কৃত হয় তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রাচীন-কালের মানুষ প্রথমে খনিজ লোহার সঙ্গে পরিচিত না থাকলেও উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে মিশে থাকা লোহার কথা তারা জানতো। কিন্তু সে লোহার পরিমাণ মানুষের চাহিদার তুলনায় ছিল খুবই অল্প। তাই মানুষ তার প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে খনিজ লোহা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। খনি থেকে তোলা লোহার সঙ্গে নানা রকমের জিনিস মিশে থাকে। তাই সেগুলি বাদ দিয়ে হাতিয়ার বা অন্যান্য জিনিস তৈরীর উপযোগী লোহার প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দেয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের দিকে চুল্লীতে খনিজ লোহা গলিয়ে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী লোহা আবিষ্কার সম্ভব হয়।

লোহার ব্যবহার ঃ মানুষ ঠিক কবে থেকে লোহার ব্যবহার শুরু করেছে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতেরা একমত নন। কেউ কেউ মনে করেন, তামার ব্যবহার শেখার আগেও মানুষ লোহার সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে লোহার জিনিস মরচে ধরে সহজেই নষ্ট হয়ে যায় বলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কালে একেবারে প্রাচীন যুগে লোহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যাযাবর শ্রেণীর লোকেরাই প্রথমে লোহার ব্যবহার শুরু করে। তামা ও ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহার হাতিয়ার বেশ শক্ত আর ধারালো। তাই যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা প্রথমে লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে।

লোহার প্রথম ব্যবহারকারী যে হোক্ না কেন, এর আবিষ্কার ও ব্যবহার সে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে প্রাচীন মানুষেরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা ছিল কেবল কয়েকটি স্থানেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু লোহার আবিষ্কারের সাথে সাথে সেই সভ্যতা দ্রুত গতিতে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এছাড়া মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনেও গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়।

লৌহ যুগের বৈশিষ্ট্য ঃ লোহার অ্যাবিষ্কারের ফলে প্রাচীন যুগের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে সমাজে ছিল প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণী। উচ্চবিত্তসম্পন্ন ধনী সম্প্রদায় আর এদের উপর নির্ভরশীল সহায়-সম্বলহীন দাস সম্প্রদায়। কেন না ঐ যুগে চাষের সাজ-সরঞ্জাম, মূলধন প্রভৃতি সবই ছিল ধনী সম্প্রদায়ের হাতে। কিন্তু লৌহ যুগে সস্তা দামের সাধারণ লোহার সাজ-সরঞ্জাম সাধারণ মানুষের হাতে আসার ফলে তাদের আর রাষ্ট্র বা বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে থাকতে হলো না। তারা নিজেরাই লোহার যন্ত্রপাতির সাহায্যে পতিত জমি উদ্ধার করে বা খাল-নালা কেটে চাষবাসের সুবন্দোবস্ত করতে সক্ষম হলো। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট শিল্পীরাও এর ফলে উপকৃত হয়।

শিক্ষার প্রসার ঃ দ্বিতীয়তঃ, লৌহযুগে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন দেখা দেয়। তাম্রযুগে লেখাপড়া কেবল রাজপুরুষ, পুরোহিত ও কেরানী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লৌহযুগে শিক্ষাচর্চা কেবল সমাজের বিশেষ বিশেষ কয়েকজনের একচেটিয়া না থেকে অনেক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণমালা বা অক্ষর উদ্ভাবনের ফলেই তা সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ. একেশ্বরবাদের প্রচলন ছিল লৌহযুগের সমাজ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাম্রযুগে প্রাচীন মানুষেরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো। কিন্তু লৌহযুগে মানুষেরা বহু দেবদেবীর পাশাপাশি এক প্রধান দেবতার উপাসনা শুরু করে। ব্যাবিলনে বেল-মারডুক, মিশরে অ্যামন, ইরাণে আহুরমজদা, ইস্রায়েলে জিহোভা, ভারতে ব্রহ্ম প্রভৃতি সর্বশক্তিমান এক ভগবানের উপাসনা লৌহযুগেই প্রচলিত হয়।

চতুর্থতঃ, মুদ্রার প্রচলন লৌহযুগের অর্থনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাম্রযুগে বিনিময় প্রথা বা এক জিনিসের বিনিময়ে অন্য জিনিস দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে ঐ যুগের শেষদিকে সুমেরবাসীরা সোনা-রূপাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রা বলতে যা বোঝায়, তার প্রচলন হয়নি। প্রকৃত মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলন হয় খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের পর থেকে। ঐ সময় রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট আকার এবং ওজনের মুদ্রা চালু হওয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে।

রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ পরিশেষে বলা যায়, লৌহের প্রচলনের ফলে প্রাচীন

মানুষের রাজনৈতিক জীবনেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। তাম্রযুগে যাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন, তাঁরা লৌহযুগে ক্রমে রাজ্যের অধিপতি হন। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ জয়ের ফলে রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাঁরা আগের মতই নিজেদের ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করতে থাকেন। তবে তাদের ক্ষমতা একেবারে সীমাহীন ছিল এমন নয়; কেন না প্রভাবশালী পুরোহিত শ্রেণীর নির্দেশ বা আদেশ তাঁদের মেনে চলতে হতো। এই আদেশ অমান্য করলে তাঁদের সিংহাসনও হারাতে হতো।

কালপঞ্জী

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব—৪০০০ অব্দ—লৌহযুগের সূচনা।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্বন্ধে কি জান? ইতিহাসের এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কি?

২। লোহার আবিষ্কার মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

৩। লৌহযুগে রাজার ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায়?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। লৌহযুগের মানুষের ধর্ম-জীবনের বৈশিষ্ট্য কি?

২। মুদ্রার প্রচলন কিভাবে মানুষেরঅর্থনৈতিকজীবনকে প্রভাবিত করেছে?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ৯ নম্বর

শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

১। লোহার আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন যুগের সমাজে—শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

২। —প্রচলন লৌহযুগের অর্থনৈতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

[ক] ব্যাবিলন

লৌহযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সকল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেগুলির মধ্যে ব্যাবিলনের সভ্যতা অন্যতম। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে সুমেরু অঞ্চলে পৃথিবীর আদি সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিরিয়া থেকে এক সেমেটিক জাতি এসে সুমের অধিকার করে এবং ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগর স্থাপন করে। লৌহযুগে এই নগরকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠে।

ব্যাবিলনের এই সভ্যতায় হামুরাবি নামে এক সম্রাটের অবদানই সবচেয়ে বেশী। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৯২ অব্দ থেকে তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো তাঁর আইন সঙ্কলন। পাথরের উপর খোদিত এই বিধিটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের সুসা নগরীতে আবিষ্কৃত হয়। এটি বর্তমানে ফ্রান্সের লুভ্র্ মিউজিয়ামে গচ্ছিত আছে। তাঁর এই বিধিটি থেকে জানা গিয়েছে যে, তিনি ব্যাবিলনের আলোর দেবতা সামাশের কাছ থেকে নিরপেক্ষ আইন রচনার অধিকার লাভ করেছিলেন। ইতিহাসে আইন লিপিবন্ধ করার নজির এই প্রথম।



হামুরাবির আইন রচনায় অধিকার লাভ

হামুবারির বিধিটি থেকে অনুমান করা যায় যে, সে সময় ব্যাবিলনে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির উদ্ভব হয়েছিল। সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা ও জনগণের মঙ্গল সাধনই ছিল সে যুগে রাজার একমাত্র কর্তব্য। সে যুগে রাজা নিজেকে জনগণের সেবক বলে মনে করতেন। প্রথমদিকে হামুরাবির আইন অনুযায়ী অপরাধের শাস্তির বিধান ছিল খুবই কঠোর। পরে অবশ্য এই নীতি পরিবর্তন করে খুন, জখম প্রভৃতি অপরাধের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তবে সমাজে আইনের চোখে সকলে সমান ছিল না। একই অপরাধের জন্য সাধারণ মানুষের যে শাস্তি হতো, সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের তার চেয়ে কঠোর শাস্তি হতো। শাস্তিবিধানের আইন ছাড়াও হামুরাবির বিধিতে আরও অনেক আইনের উল্লেখ রয়েছে। এদের

একটিতে ডাক্তার, শ্রমিক, কর্মচারী, নৌকার মাঝিমাল্লা প্রভৃতি লোকদের মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। তবে কর্তব্যে অবহেলার জন্য এদের শাস্তির বিধানও ছিল কঠোর। সমাজে প্রাণদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। সে যুগে মেয়েরা মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করতো। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে পর্দা প্রথাও প্রচলিত ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ হাম্মুরাবির বিধিগুলি থেকে সে যুগের ব্যাবিলনের মানুষদের অর্থনৈতিক জীবনেও পরিচয় পাওয়া যায়। হাম্মুরাবির অনেক আইনই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত। তাই অনেকে ব্যাবিলনের সভ্যতাকে বাণিজ্য-ভিত্তিক সভ্যতা বলে মনে করেন। এই যুগে ভারত, মিশর, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যাবিলনের বাণিজ্য সম্পর্কে গড়ে উঠে।

কৃষি ও বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। এখানকার জমি ছিল অতিশয় উর্বর উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ফলত। এছাড়া ছিল পশুচারণ ক্ষেত্র। কৃষি ছাড়া পশুপালনও ছিল জীবিকা অর্জনের আর একটি উপায়। কৃষক ও পশু পালক ছাড়াও সমাজে আরও একটি শ্রেণী ছিল। তারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করত। ব্যাবিলন হতে বণিকরা জলপথে দেশ-দেশান্তরে যে সকল পণ্য রপ্তানি করত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পশম, ধাতুনির্মিত নানা ধরনের পণ্য, বহুমূল্য পাথর, কাঠ এবং খাদ্যশস্য। বাণিজ্য চলত পারস্য, ভারতবর্ষ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে। বিদেশের বণিকরা রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে ব্যবসা করতে আসত।

রাজ্যের বড় বড় শহরের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ ছিল। এক শহর থেকে অন্য শহরে দ্রুত মাল পেঁছানো যেত। শহরের দোকানগুলিতে দর-দাম করে জিনিস কেনাবেচা হতো। নগরবাসীরা বাজারের শান্তিরক্ষা করত।

চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়ে লেনদেন হতো। হিসাবরক্ষক মাটির টালির উপর চুক্তিপত্র লিখত। ক্রেতা, বিক্রেতা ও সাক্ষীকে চুক্তিপত্রে সই করতে হতো। তারপর সেই মাটির টালির চুক্তিপত্র পুড়িয়ে শক্ত করে রাখা হতো। এই ধরনের চুক্তিপত্র, আয়-ব্যয়ের তথ্যসম্বলিত অনেক টালি ব্যাবিলনের শহরগুলিতে পাওয়া গিয়েছে।

মন্দির ও পুরোহিত ঃ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এক ঈশ্বরের উপাসনা। ব্যাবিলনবাসীরা বিভিন্ন দেবদেবীর পুজা করলেও এক দেবতাকে সকল দেবতার উপরে স্থান দিয়েছিল। তাদের এই সর্বশক্তিমান দেবতার

নাম মারডুক। এই দেবতার উদ্দেশ্যে ব্যাবিলনবাসীরা তৈরি করেছিল সুন্দর সুন্দর মন্দির ও জিগ্‌গুরাত। এই সব মন্দিরেই বাজার বসত ও অর্থের আদান-প্রদান হতো। পুরোহিতরা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে ধন-সম্পত্তি পরিচালনা করতেন। মন্দিরের সঞ্চিত অর্থে পুরোহিতরা মহাজনী কারবার করতেন।

মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতো এঁরাও সমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। এঁরা যে কেবল পূজা করতেন তা নয়, এঁদের অনেকেই বিচারক, লেখক বা কেরাণীর কাজ করতেন। মন্দিরে শিক্ষাদনের ব্যবস্থা ছিল। তাই শিক্ষার উপরেও পুরোহিতদের কর্তৃত্ব ছিল। পুরোহিতরা বিচার করতেন, আইনের বিধান দিতেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ শিক্ষা-দীক্ষাতেও ব্যাবিলনবাসীরা যথেষ্ট উন্নত ছিল। সুমেরীয়দের মত তারাও ক্যুনিফর্ম লিপি ব্যবহার করতো। এ সময়ে তাদের সাহিত্যও বিশেষ উন্নত হয়। এই প্রসঙ্গে গিলগ্যামেজের মহাকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যাবিলনের অধিবাসীদের সহজ ভগ্নাংশ ঘননির্ণয় যেমন, $২^৩ = ২ \times ২ \times ২$ বর্গনির্ণয়, বর্গমূল নিয়ে গণিতের এই চারটি নিয়ম ভালভাবে জানা ছিল। কৃষিকার্য, খাল খনন, মন্দির নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে এরা গণিতের নিয়ম প্রয়োগ করত।

ব্যাবিলনীয়রা আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারতেন এবং জ্যোতিষীরা গ্রহ নক্ষত্রের পার্থক্যও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় আগে থেকে হিসাব করে বলতে পারতেন। তাঁরা প্রত্যেক গ্রহের জন্য এক একটি দেবতাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ব্যাবিলনবাসীরা গণিত শাস্ত্রেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। তাদের হিসাব অনুযায়ী বছর হয় ৩৫৪ দিনে। এর মধ্যে ছয়টি মাস ছিল ৩০ দিনের আর বাকী ছয়টি ছিল ২৯ দিনের। তারা চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। সময় ঠিক করার জন্য ঐ সময় জলঘড়ি ও সূর্য ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়।

স্থাপত্য শিল্প ঃ মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণেও ব্যাবিলনবাসীরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। মারডুক, ইস্তার প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির ছিল ব্যাবিলনীয় স্থাপত্য শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান। সম্রাট্ নেবুকাডনেজার তার এক রাণীর বেড়াবার জন্যে এটি তৈরী করেন। এই উদ্যানটি সারি সারি থামের

উপর ছাদ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। গ্রীকরা এই উদ্যানকে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম বলে মনে করতো।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টপূর্ব ... ২১২৩-২০৮১ অব্দ— হাম্মুরাবির রাজত্বকাল

৬০৫-৫৫২ „ নেবুকাডনেজারের রাজত্বকাল

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। হাম্মুরাবির আইনবিধি থেকে প্রাচীন ব্যাবিলনের সমাজের কি চিত্র পাওয়া যায়?

২। প্রাচীন ব্যাবিলনের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কি জান?

৩। প্রাচীনকালে ব্যাবিলনবাসীর শিক্ষা-দীক্ষা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে কি জান? [৫+৪]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান সম্পর্কে কি জান?

২। ব্যাবিলনের জ্যোতিষ-বিদ্যা সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

৩। ব্যাবিলনের প্রথম দেবতার নাম কি?

৪। কে ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান তৈরী করেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর

প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে কে প্রথম আইন-কানুন সংকলন করেন? ডান দিকে চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও:

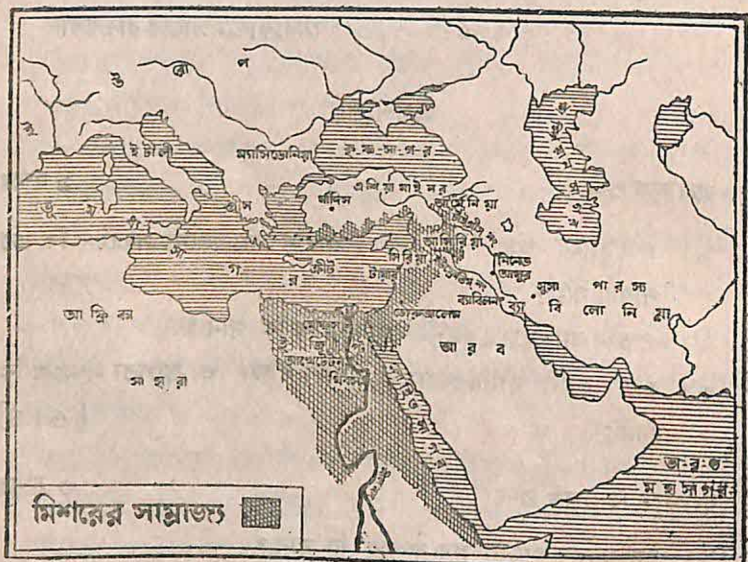
তৃতীয় থুটমোস □ অসুরবনিপাল

ডেরিয়াস □ নেবুকডনেজার

হাম্মুবারি □

———

পিরামিডের যুগে মিশরের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের দিকে হিক্‌সস্‌ নামে এক বিদেশী জাতি মিশরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু দুশো বছর পরে তারা মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের দ্বারা উৎখাত হয়। এই সময় মিশরীয়রা তাদের পুরাতন রাজধানী মেম্‌ফিস্‌ ত্যাগ করে থিবস্‌ নগরে রাজধানী স্থাপন করে। এই অষ্টাদশ রাজবংশের



সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন প্রথম থুটমোস্‌। তাঁর রাজত্বকালে মিশর সাম্রাজ্য পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। তিনি পশ্চিম সিরিয়ার রাজাকে পরাস্ত করে তাঁকে কর দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সিরিয়া মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। তাই অষ্টাদশ রাজবংশের তৃতীয় রাজা তৃতীয় থুটমোস্‌ মাত্র বাইশ বছর বয়সে সিরিয়া এবং তার মিত্রদের পরাজিত করে সিরিয়াকে মিশর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া তিনি প্যালেস্টাইন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের বিরুদ্ধে আরও ষোলটি অভিযান পাঠিয়ে জয়লাভ করেন। এইভাবে তৃতীয় থুটমোসের আমলে সিরিয়া প্যালেস্টাইন, ফিনীসিয়া প্রভৃতি দেশে মিশরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মিশরীয় সম্রাটদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রণতরী গঠন করেন। এবং তারই সাহায্যে ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে মিশরের আধিপত্য স্থাপন করেন।

পরবর্তীকালে উনবিংশ রাজবংশের বিখ্যাত শাসক দ্বিতীয় র‍্যাম্‌সিস্ সোনার জন্য মিশরের নিকটবর্তী নুবিয়া রাজ্যটি অধিকার করেন। পরে এই সোনার সাহায্যেই বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করে তিন পশ্চিম এশিয়ার বিদ্রোহী রাজ্যগুলিকে শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হন। প্রধানতঃ হিট্টি নামে এক জাতির বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযানে প্রথমে তিনি প্যালেস্টাইন অধিকার করেন। পরে তিনি সিরিয়ার সঙ্গে কাদেশের যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলার পর এক সন্ধির দ্বারা এর পরিসমাপ্তি ঘটে। সম্ভবতঃ, এই সময়েই কিছু সংখ্যক ইহুদী, ক্রীতদাস বা উদ্বাস্তু হিসাবে মিশরে বসবাস শুরু করে। এইসব যুদ্ধ জয়ের ফলে মিশর প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়, কিন্তু কালক্রমে এই সাম্রাজ্যেরও অধঃপতন দেখা দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মিশর অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। অবশেষে ৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মিশর পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পুরোহিতদের শক্তি বৃদ্ধিঃ মিশরের সম্রাটরা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও তাঁদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হতো। মিশর সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যগুলি থেকে যে সম্পদ আসতো, তার একটা বিরাট অংশ মিশরের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনার জন্য ব্যয় করা হতো। আর এই সকল দেবদেবীর দেখাশুনার দায়িত্ব ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের। তাই দেবদেবীর জন্য নির্দিষ্ট অর্থ পুরোহিত সম্প্রদায়েরই ভোগবিলাসে ব্যয়িত হতো। এরই ফলে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা দিন দিন ক্রমশঃই বাড়তে থাকে এবং র‍্যামসিসের রাজত্বকালে এই ক্ষমতা সর্বোচ্চ শীর্ষে পেঁছে। ঐ সময় মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায়ের এক লক্ষ সাত হাজার ক্রীতদাস, সাড়ে সাত লক্ষ চাষের জমি ও পাঁচ লক্ষ গরু ছিল। তাছাড়া তারা সিরিয়া ও মিশর সাম্রাজ্যের একশত উনসত্তরটি শহরের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। তৃতীয় র‍্যাম্‌সিস্ আমন দেবতার পুরোহিতদের বত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম সোনা, এক লক্ষ কিলোগ্রাম রূপা আর বছরে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বস্তা খাদ্যশস্য দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। মিশরীয় সমাজ-ব্যবস্থায় পুরোহিত শ্রেণী অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এইভাবে মিশরীয় সমাজে সুবিধাভোগী এক বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। আর তাদের এই সুবিধা ভোগের জন্য সাধারণ মানুষকে অশেষ দুঃখ সহ্য করতে হতো।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টপূর্ব	১৫৪৫—১৪ অব্দ	প্রথম থুটমোসের রাজত্বকাল।
”	১৪৭৯—৪৭ ”	তৃতীয় ” ”
খ্রীষ্টপূর্ব	১৩০০ ১২৩৩ ”	দ্বিতীয় র‍্যামসিসের ”
”	১২৮৮ ”	কাদেশের যুদ্ধ।
”	১২০৪-১২৭২ ”	তৃতীয় র‍্যামসিসের রাজত্বকাল।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। মিশর কিভাবে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল তার বিবরণ দাও।

২। প্রাচীন মিশরের পুরোহিত শ্রেণীর ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। মিশরীয় সমাজ-ব্যবস্থায় এর কি প্রভাব লক্ষ্য কর? [৫+৪]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। তৃতীয় থুটমোসের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী লিপিবদ্ধ কর।

২। দ্বিতীয় র‍্যামসিসেরা রাজত্বকালে মিশরীয় সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হয়।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর

১। কোন্ মিশরীয় সম্রাট সর্বপ্রথম রণতরী গঠন করেন?

২। হিট্টিদের বিরুদ্ধে কোন্ মিশরীয় সম্রাট অভিযান প্রেরণ করেন?

———

(গ) ইরাণ

পারস্যের উত্থান ঃ পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান ইরাণ দেশটি লৌহযুগের সভ্যতার এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। পণ্ডিতেরা মনে করেন, 'ইরাণ' কথাটির উদ্ভব প্রাচীন 'এরিয়ান' শব্দ থেকে হয়েছে। এরিয়ানা শব্দটির অর্থ হলো আর্যদের বাসভূমি। ইরাণ ছিল আর্য জাতির একটি শাখার বাসস্থান। আর্যদের এই শাখাটি তখন মিড নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে এসে এরা বর্তমান ইরাণের উত্তর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। পরে মিড্‌রা যুদ্ধে আসিরীয়দের হারিয়ে দিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাস মধ্যেই মিড্‌ সাম্রাজ্য পারসিকদের হস্তগত হয়। ইরাণে মিড্‌দের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ঠিকই, কিন্তু সেদেশের সভ্যতায় তার অবদান নেহাৎ কম ছিল না। মিড্‌ রাজাদেরই আমলে ছত্রিশ অক্ষরের ইরাণী বর্ণমালার উদ্ভব হয় এবং লেখার জন্য মাটির ফলকের পরিবর্তে পার্চমেন্ট ও কলমের ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া প্রাচীন পারসিক ভাষার উৎপত্তিও এই সময়েই হয়।

কাইরাস ও পারস্য সাম্রাজ্য-বিস্তার ঃ প্রাচীন ইরাণে মিড্‌দের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো কাইরাসের নেতৃত্বে পারসিকদের অভ্যুত্থান। কাইরাস ছিলেন মিড্‌ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পারস্যের আনসান্‌ অঞ্চলের শাসক। তিনি ছিলেন অসামান্য যোদ্ধা ও দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে মিড্‌দের কর্তৃত্ব ধ্বংস করে পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তিনি পূর্বদিকে হিন্দুকুশ পর্বতের পাশাপাশি অঞ্চল এবং ভারতের উত্তর সীমান্তে গান্ধার (রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পেশোয়ার) দেশটিও অধিকার করেন। তাঁর পুত্র ক্যাম্বিসিস্‌ মিশর দেশটি জয় করে পারস্য সাম্রাজ্যের সীমা আরও সম্প্রসারিত করেন।



দারায়ুস

দারায়ুস ঃ ক্যামবিসিস-এর মৃত্যুর পর পারস্য সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিল। অবশেষে ক্যামবিসিস-এর এক আত্মীয় দারায়ুস ৫২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের সিংহাসনে বসেন। পারস্য সাম্রাজ্যর সীমা আরও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দারায়ুসের দিগ্বিজয়ের এই কাহিনী ইরাণের বেহিস্তানে আবিষ্কৃত পর্বতের গায়ে খোদাই করা লিপি থেকে জানা গিয়েছে। এই লিপি থেকেই জানা গিয়েছে, উত্তরে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে দক্ষিণ পারস্য

উপসাগর এবং পূর্বে ভারতের সিন্ধুদেশ থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত দারায়ুসের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

দারায়ুসের গ্রীসদেশ অভিযান ঃ শেষ বয়সে দারায়ুস গ্রীসদেশ জয়েরও চেষ্টা করেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, পারস্যের বিরুদ্ধে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক উপনিবেশগুলির বিদ্রোহই ছিল গ্রীক-পারসিক সংঘর্ষের মূল কারণ। যাই হোক দারায়ুসের দূতেরা গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে পারস্যের বশ্যতা স্বীকার করার দাবি জানায়। কিন্তু গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টা নামে দুটি রাজ্য পারস্যের প্রভুত্ব মেনে চলতে অস্বীকার করে। ফলে এথেন্সের সঙ্গে দারায়ুসের প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়। এই যুদ্ধে এথেন্স স্পার্টার সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠায়। স্পার্টার সাহায্য পেঁছাবার পূর্বেই এথেন্স ম্যারাথনের যুদ্ধে পারসিক্ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। পরেও গ্রীকদের সঙ্গে পারসিকদের অনেকবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল।

ম্যারাথনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার আগেই দারায়ুসের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর ফলে পারস্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ শেষ হয়। অবশেষে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের চিহ্ন এখন না দেখা গেলেও মানবসভ্যতায় পারসিকদের অবদান একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। পারসিকরা স্থাপত্যশিল্পে খুবই পারদর্শী ছিল। তারা সুন্দর সুন্দর বাসগৃহ ও শহর তৈরী করে অভ্যস্ত ছিল। এরূপ একটা সুন্দর ও বিখ্যাত শহর ছিল পার্সিপোলিস। ভারতীয় আর্যদের মত প্রাচীন ইরাণী আর্যরা ছিল বহু দেব-দেবীর উপাসক। তাই প্রাচীন ইরাণের দেব-দেবীর সঙ্গে ভারতীয় বৈদিক দেবদেবীর যথেষ্ট মিল দেখা যায়। ইরাণীদের মিথ্ (সূর্য) ছিলেন বৈদিক মিত্র, আর ইরাণী 'অতর' হলেন বৈদিক 'অগ্নি'। বৈদিক আর্যদের সোমরস ছিল ইরাণের হোম, আর এই হোম পানই ছিল ইরানীর ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ।

লৌকিক মত অনুযায়ী খৃীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে জরথুষ্ট্র নামে এক ধর্মগুরু ইরাণে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর এই ধর্মমত **'আবেস্তা'** নামে এক গ্রন্থে লিপিবন্ধ রয়েছে। জরথুষ্ট্রের পিতা ছিলেন এক পুরোহিত আর মাতা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। জরথুষ্ট্রের জ্ঞানপিপাসা ছিল সীমাহীন। তাই তিনি সংসার ছেড়ে নির্জন পর্বতে ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হন। সেখানে নানা অশুভ শক্তি তাঁর সাধনায় বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত না

হয়ে তিনি আহুর (ঈশ্বর) মাজ্‌দা (জ্ঞানময় বা জ্ঞান বা আলোকময় ঈশ্বরের) চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে আহুর মাজদা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আবেস্তা নামে পুস্তকটি দান করেন এবং সমাজে তাঁর ধর্ম প্রচারের আদেশ করেন। এরপর তিনি ইরাণে এক ঈশ্বরের কথা প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে নানাবিধ দৈহিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। অবশেষে ইরাণের একজন রাজা তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে স্বীকৃত হন। এইভাবে জরথুষ্ট্র ধর্মমতের উদ্ভব হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার পর শেষে বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জরথুষ্ট্রের বাণীর মূলকথা ছিল জগতে সব সময়েই সত্য-মিত্যা, পাপ-পুণ্যের বিরোধ লেগে আছে। জগতে যা কিছু সত্য বা আলোকময় তার প্রতীক হলো আহুর মাজদা আর যা কিছু খারাপ বা অন্ধকারময় তার প্রতীক হলো সহ্‌রিমন্। সুতরাং জরথুষ্ট্রের মতে মাজ্‌দার উপাসনাই হলো সত্য বা জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

ইরাণীদের কাছে আগুন খুবই পবিত্র। তাই অনেকে এদের অগ্নির উপাসক বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরাণীরা আগুনকে ভগবানের দান বলে খুবই পবিত্র মনে করে। তাই তারা আগুনে মড়া পোড়ায় না ; মড়াকে খোলা জায়গায় রেখে দিয়ে শকুণ প্রভৃতি পাখীকে দিয়ে খাওয়ায়। আর আগুনও নিভতে দেয় না, সব সময়েই জ্বালিয়ে রাখে। ইরাণে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর বহু ইরাণী ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে এরা পারসী নামে পরিচিত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এখনও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

কালপঞ্জী

খৃীষ্টপূর্ব	৬৬০—৫৮৩ অব্দ—জরথুষ্ট্রের জীবনকাল
,,	৫৫৯—৫২৯ ,,—কাইরাসের রাজত্বকাল
,,	৫২১—৪৮৫ ,,—দারায়ুসের ,,
খৃীষ্টপূর্ব	৪৯০ অব্দ ম্যারাথনের যুদ্ধ
,,	৪৮৫—৪২৩ ,, জারেক্সেসের রাজত্বকাল
,,	৪৮০— ,, সালামিসের নৌযুদ্ধ

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। কাইরাসের রাজত্বকাল থেকে জারেকসেসের রাজত্বকাল পর্যন্ত পারস্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা কর।

২। জরথুষ্ট্র কে ছিলেন ? তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে লেখ। [৪+২]

৩। প্রাচীন ইরাণীদের ধর্ম, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। পারস্যের ইতিহাসে মিড্ জাতির অবদান কি ছিল ?

২। ম্যারাথনের যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। জারেকসেসের গ্রীসদেশ অভিযানের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

৪। জরথুষ্ট্রের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ৯ নম্বর

১। কোন্ শব্দ থেকে ইরাণ শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।

২। প্রাচীন ইরাণে আর্যজাতির যে শাখা বাস করতো, তার নাম কি ?

৩। যিনি ম্যারাথন যুদ্ধজয়ের সংবাদ এথেন্সে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম কি ?

৪। কোন্ পারস্য সম্রাট থার্মোপোলিতে গ্রীক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ?

৫। (ক) পারস্য সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন ? ডানদিকে চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :

ক্যাম্বিসিস ☐ দারায়ুস ☐

জারেক্সেস ☐ কাইরাস ☐

(খ) ইরাণের মঙ্গলময় দেবতার নাম কি ? ডানদিকে চিহ্ন দিয়ে সঠিক উত্তরটি দেখাও :

অহির্মান ☐ আহুর-মাজদা ☐

জিহোবা ☐ ওসাইরিস ☐

———

(ঘ) ইহুদীদের কথা

ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে বর্তমানে যে দেশটি ইস্রায়েল নামে পরিচিত, তার অধিবাসীদের বলা হয় **ইহুদী**। প্রাচীনকালে এদের **হিব্রুও** বলা হতো। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের **'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'** নামক অংশ থেকে ইহুদীদের কথা ও চিন্তাধারার কাহিনী জানা যায়। কথিত আছে, ঈশ্বর ইহুদীদের নেতা **আব্রাহাম** ও তাঁর বংশধরদের জন্য ইস্রায়েল অঞ্চলটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আব্রাহাম আসার আগে ঐ অঞ্চল ছিল **ক্যানান** নামে এক জাতির বাসস্থান। আব্রাহাম মেসোপোটেমিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে চলে এসে ক্যানানদের হটিয়ে দিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। পরে তাঁর পৌত্র ইস্রায়েলের নাম অনুসারে ঐ স্থানের নাম হয় ইস্রায়েল। কিন্তু কিছুকাল পরে ইস্রায়েলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাই অনেক ইহুদী ইস্রায়েল ছেড়ে গিয়ে মিশরে বাস করতে শুরু করে।

মোজেস ঃ মিশরের ফ্যারাওরা নানাভাবে ইহুদীদের নির্যাতন করতে শুরু করে। তারা ইহুদীদের উপর বিপুল পরিমাণ করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এইভাবে নির্যাতিত হয়ে ইহুদীরা মোজেস নামে এক নেতার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কথিত আছে, মিশর ত্যাগের সময় মিশরের ফ্যারাও তাঁর সেনাদল নিয়ে ইহুদীদের পিছনে তাড়া করেন। লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে মোজেস তার লাঠিটি বাড়িয়ে ধরলে সমুদ্রের জল দু'ভাগ হয়ে ইহুদীদের যাবার পথ করে দেয়। ইহুদীরা লোহিত সাগরের অপর পারে পৌঁছুলে মোজেস তাঁর লাঠিটি সরিয়ে নেন। ফলে সমুদ্রের জল এক হয়ে গিয়ে মিশরের সেনাদলকে ডুবিয়ে দেয়। মোজেস ইহুদীদের নিয়ে সিনাই পর্বতে পৌঁছুতে সক্ষম হন। এইভাবে মিশরীয়দের হাত থেকে ইহুদীদের মুক্তিলাভ ঘটে। সিনাই পর্বতে মোজেস ঈশ্বরের কাছ থেকে দশটি আদেশ লাভ করেন। এইগুলি হলো—লোভ ত্যাগ করা, সত্যকথা বলা, সৎপথে থাকা, সৎ জীবন-যাপন করা, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা প্রভৃতি। এই দশটি আদেশই হলো ইহুদীদের ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। এগুলি বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশে লিখিত রয়েছে।

মোজেসের নেতৃত্বে দাসমুক্ত ইহুদিগণ এর পর ৪০ বছর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর নির্দিষ্ট ক্যানানে উপস্থিত হয় এবং ক্যানান অধিকার করে সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাস আরম্ভ করে। এদের মধ্যে প্রথম রাজা ছিলেন সল আর দ্বিতীয় রাজা হলেন ডেভিড। তিনি ক্যানানাদের প্রধান নগর জেরুজালেম জয় করে সেখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ডেভিডের পুত্র সলোমন ছিলেন এই রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা। তারই রাজত্বকালে ইস্রায়েল রাজ্যটি গৌরবের



মোজেস কর্তৃক ইহুদীদের মিশর ত্যাগের নির্দেশ দান

চরম শিখরে উঠে। তিনি জেরুজালেম নগরে ইহুদীদের দেবতা জিহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির ও একটি চমৎকার রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন। সলোমন তাঁর গভীর জ্ঞান ও ন্যায় বিচারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সলোমনের মৃত্যুর পর ইস্রায়েল মিশর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবে প্রাচীন ইহুদীদের রাজ্যটি ধ্বংস হলেও প্রাচীন জগতের ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে ইহুদীদের অবদান ছিল অপরিসীম। তাঁদের ধর্মগুরুরা বহু দেব-দেবীর উপাসনার পরিবর্তে এক ঈশ্বর বা জিহোবার উপাসনার রীতি

প্রবর্তন করেন। পরবর্তিকালে খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে এই আদর্শই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কালপঞ্জী

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব	১৬৫০	অব্দ—ইহুদীদের মিশর গমন
,, ,,	১২২০	,, ,, ,, ত্যাগ
,, ,,	১২০০	,, ,, ,, ক্যানন জয়
,,	১০২৫-১০	,, সলের রাজত্বকাল
,,	১০১০-৯৭৪	,, ডেভিডের ,,
,,	৯৭৪-৩৭	,, সলোমনের রাজত্বকাল

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন — নয় নম্বর

১। ইহুদীদের মিশরবাস ও ত্যাগের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জান? [৪+৫]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন — তিন নম্বর

১। ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করেছিল কেন?

২। মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীদের মিশর ত্যাগের গল্পটি লিখ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন — এক নম্বর

১। বর্তমান ইস্রায়েলের অধিবাসীদের কি বলা হয়?

২। প্রাচীনকালে ইস্রায়েলের অধিবাসীদের কি বলা হতো?

৩। কেন ইস্রায়েলের নাম ঐরকম হয়েছে?

৪। ইহুদীদের আসার আগে ইস্রায়েলে কোন্ জাতি বাস করতো?

৫। ইহুদীদের দেবতার নাম কি?

৬। কার নেতৃত্বে ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করে?

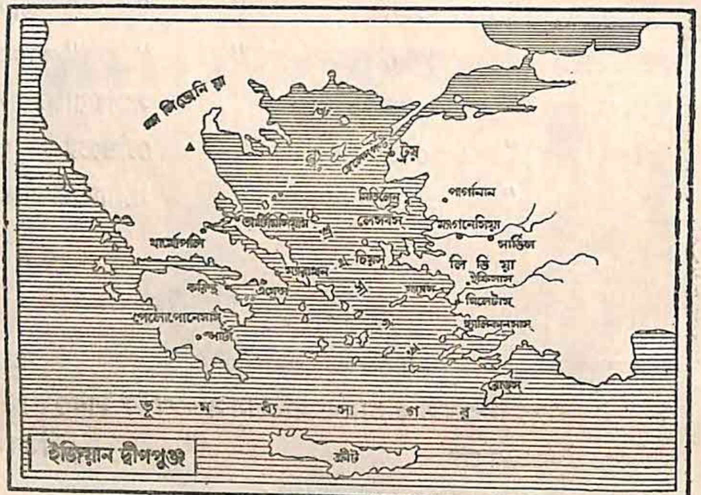
৭। বাইবেলের কোন অংশে প্রাচীন ইহুদীদের কথা লেখা আছে?

অধ্যায়

৬

গ্রীস দেশের কথা

গ্রীসের উপর ক্রীট দ্বীপের প্রভাব ঃ ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত দেশগুলির একটি হলো গ্রীস। এই দেশটিও মানুষের প্রাচীন সভ্যতার আর এক



লীলাভূমি। গ্রীসের পূর্বদিকে ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর; আর দেশটির ভিতরে রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়-পর্বত। এসবের ফলে রচিত হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বাধা। তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা থাকার ফলে গ্রীকরা হয়ে উঠেছে দুর্ধর্ষ নাবিক।



গ্রীসের পোড়া মাটির চিত্র

গ্রীসদেশটি আয়তনে বিরাট নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, গ্রীসদেশের সভ্যতা পুরোপুরি নিজস্ব নয়। ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপটির সভ্যতাও সংস্কৃতি এই দেশের সভ্যতায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন গ্রীসের বাসন-পত্র, ধাতুশিল্প, ঘরবাড়ি তৈরীর কৌশল, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতিতে ক্রীটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

হোমারের যুগে গ্রীসের কথা ঃ প্রাচীন গ্রীকরা ছিল আর্য জাতিরই এক

শাখা। এদের কবি ও চারণেরা পথে পথে দেশের প্রাচীন বীরদের কীর্তিকাহিনীর গান গেয়ে বেড়াতেন। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের এরকমই এক কবি ছিলেন হোমার। তিনি ছিলেন অন্ধ। কথিত আছে, তিনি ইলিয়াড এবং ওডীস নামে দুখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় গ্রীসের মহাকবি। ইলিয়াড নামে মহাকাব্যটি ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ট্রয় ছিল এশিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি নগর। একবার এই নগরের রাজপুত গ্রীকরাজ মেনিলাসের অপরূপ সুন্দরী রাণী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যান। তাই গ্রীসদেশের সমস্ত রাজ্য মিলে ট্রয় নগরী আক্রমণ করেন। দীর্ঘ বারো বছর অবরোধের পর শেষে তাঁরা ট্রয় নগরী ধ্বংস করতে সক্ষম হন। ট্রয় ধ্বংসের পর গ্রীসে ফেরার পথে ওডীসয়ুস নামে এক গ্রীকবীরকে পথে নানা বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। এই সকল বিপদের মধ্যে পড়েও


হোমার

ওডীসয়ুস কি ভাবে সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে সেগুলির মোকাবিলা করেছিলেন, তারই কাহিনী অবলম্বনে ওডীস রচিত।

ইলিয়াড এবং ওডীস থেকে ট্রয়ের যুদ্ধ এবং ওডীসয়ুসের কাহিনী ছাড়াও প্রাচীন গ্রীকদের জীবনযাত্রার এক সুন্দর চিত্রও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মতো প্রাচীন গ্রীকদের সমাজেরও ভিত্তি ছিল পরিবার। গ্রীকরা সে সময় চাষবাস ও পশু-পালন করে জীবিকা অর্জন করতো। তারা আর্য জাতির অন্যান্য শাখার মত বহুদেব-দেবীর পূজা করতো। তারা মনে করতে স্পার্টার উত্তরে অলিম্পাস পর্বতে দেব-দেবীরা বাস করেন। এই সকল দেবতার রাজা ছিলেন জিউস। অ্যাপোলো ছিলেন সকল কাজের দেবতা। পরে তিনি গ্রীসের প্রধান দেবতায় পরিণত হন। অনেকে তাঁকে জিউসের পুত্র বলে মনে করেন। এথেনা ছিলেন গ্রীকদের জ্ঞানের দেবী। তিনি জিউসের মস্তক থেকে

জন্মেছিলেন বলে বলা হয়। এই এথেনার নাম থেকেই এথেন্স নামটির উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

গ্রীক নগররাষ্ট্র ঃ প্রাচীনকালে গ্রীকরা প্রথমদিকে গ্রামেই বাস করতো ; ক্রমশঃ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট নগরের পত্তন হয়। পাহাড়-পর্বতে ঘেরা গ্রীসদেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত খুব সহজ ছিল না। তাই গ্রীসের এই সব নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক একটি রাষ্ট্র। সেজন্য এগুলিকে বলা হতো নগররাষ্ট্র। এই সকল নগররাষ্ট্রের মধ্যে এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিব্‌স্‌, আর্গস প্রভৃতি ছিল প্রধান। এগুলির মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকতো। এদের আয়তন ছিল মাত্র কয়েক বর্গমাইল। আর লোকসংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। এর ফলে প্রত্যেক নগররাষ্ট্রের সকল নাগরিকই দেশ শাসনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে পারতো এবং এদের নিয়ে গড়ে উঠতো এক একটি গণসভা। এথেন্সে এই গণসভার নাম ছিল ইক্লেসিয়া, আর স্পার্টায় এই সভাকে বলা হতো এপেলা। যুদ্ধ, শান্তি, আইন রচনা প্রভৃতি বিষয়ে এই সভার মতামত ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এই মতই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হতো। এছাড়া ছিল অভিজাত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সভা যা বিভিন্ন বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দিত। তবে রাজাই ছিলেন একদিকে রাষ্ট্রের প্রধান পুরোহিত ও প্রধান বিচারক এবং অন্য দিকে প্রধান সেনাপতি। তাঁকে দেবতার বংশ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হতো। সব নগররাষ্ট্রের একজন করে রাজা থাকতেন ; কিন্তু স্পার্টায় ছিল দু'জন রাজা। পরবর্তী কালে রাজ্যের অভিজাত ব্যক্তিরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলে রাজার ক্ষমতা কমে যায়। এথেন্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। তবে স্পার্টা, ম্যাসিডন প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজতন্ত্র বজায় থাকে।

সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঃ গ্রীস দেশটি ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও এদের ঐক্যভাব ছিল খুবই প্রবল। কেননা এরা মনে করতো যে এক আদি-পুরুষ থেকে এদের সকলের জন্ম হয়েছে। এছাড়া একই রকমের ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীর পূজা-অর্চনাও এদের ঐক্যকে বেশী দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে এই ঐক্যের ধারণা কোন রাজনৈতিক ছিল না। কেননা নগররাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্রথাকতে ভালোবাসতো। রক্তের সম্পর্ক ও ধর্মবিশ্বাস ছাড়া একই রকমের ভাষা এবং হোমারের মহাকাব্য ছিল গ্রীসদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ডেলফির

দৈববাণী এবং এই অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানকে খুবই সহজ করে তুলেছিল। ডেলফি নগরীতে এ্যাপোলো দেবতার মন্দিরে দৈববাণী শোনবার জন্যে সকল নগররাষ্ট্র ও গ্রীক উপনিবেশগুলির গ্রীকেরা এসে উপস্থিত হতো। এই উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় সম্ভব হতো। অলিম্পিক ক্রীড়াকে কেন্দ্র করেও গ্রীকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গ্রীসের দক্ষিণ-পশ্চিমে ওলিম্পিয়া নগরীতে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দ থেকে প্রতি চার বছর অন্তর এই অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিযোগিতায় গ্রীসের সকল নগররাষ্ট্র ও গ্রীক উপনিবেশ থেকে গ্রীকরা এখানে মিলিত হতো। যদি এ সময় কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ চলতো, তবে প্রতিযোগিতার দিনগুলিতে তা বন্ধ থাকতো। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর পুরস্কার ছিল বুনো অলিভ পাতার সবুজ মুকুট। অবশ্য বিজয়ীরা নিজ নিজ দেশের রাজার কাছ থেকে লাভ করতো বহুমূল্য উপহার। এইভাবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতাকে উপলক্ষ্য করে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রীকদের মধ্যে ভাব বিনিময় হতো এবং গ্রীকরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্পর্কে সচেতন হতো।



ডেলফির দৈববাণী

গ্রীকদের উপনিবেশ বিস্তার ঃ অতি প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীকরা ইজিয়ান ও ভূমধ্যসাগর পার হয়ে গ্রীসের বাইরে নানা দেশে বসতি স্থাপন শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অজানাকে জানার অদম্য স্পৃহা, গ্রীসের ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি গ্রীকদের উপনিবেশ গড়ে তুলতে প্রেরণা যোগায়।

তাই এশিয়ার বিভিন্ন অংশ, ইতালি, সিসিলি প্রভৃতি অঞ্চলে গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠে।

এথেন্স ও স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন : প্রাচীন গ্রীসে যে সকল নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টা নামে রাষ্ট্র দুটি ক্রমে প্রধান হয়ে উঠে। এদের মধ্যে আবার শিক্ষা-দীক্ষায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এথেন্স স্পার্টাকে ছাড়িয়ে গ্রীসে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এথেন্সের নাগরিকদের শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হতো। এর জন্য ছিল ছোট-বড় নানারকম বেসরকারী বিদ্যালয়। এই সকল বিদ্যালয়ে সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হতো। ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, ব্যাকরণ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ছিল তাদের শিক্ষার বিষয়। শরীর গঠনের জন্য শিক্ষায় ব্যায়ামেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। আঠারো বছর বয়স থেকে এথেন্সের যুবকদের নাগরিকের কর্তব্য ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। সামরিক শিক্ষা শেষে তাদের দেশরক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হতো। একুশ বছর বয়স হলে তারা নাগরিকের অধিকার লাভ করতো।

এথেন্সের পুরুষেরা রাস্তা কিংবা বাজারের মধ্যে এখানকার ক্লাবের মতো কোন জায়গায় বেশির ভাগ সময় কাটাতো। কেননা জীবিকা অর্জনের জন্য তাদের অধিক সময় ব্যয় করতে হতো না। ঐ সকল স্থানে তারা বন্ধু-বান্ধব ও চেনা-জানা লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতো। এথেন্সবাসীরা রাজনীতি চর্চা খুবই ভালবাসতো। তাই বিকালে তাদের অনেকেই ইক্লেসিয়ায় উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতো। এছাড়া আদালতে তাদের প্রায়ই বিচারের কাজ করতে হতো। নিয়ম অনুয়ায়ী তারা বছরে ইক্লেসিয়ার চল্লিশটি সভা করতো।

কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার ছিল গভীর পার্থক্য। তারা এথেন্সবাসীদের মতো রাজনৈতিক বিষয়ে অত আগ্রহী ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষায়ও স্পার্টা এথেন্স থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। স্পার্টার প্রত্যেক নাগরিককে সুদক্ষ সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কথিত আছে, লাইকারগাস নামে এক ব্যক্তি স্পার্টার এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শোনা যায়, সেখানে রুগ্ন, দুর্বল ও বিকলাঙ্গ শিশুদের পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে দেওয়া হতো। সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সাত বছর বয়স থেকে স্পার্টার বালকদের শিক্ষা দেওয়া হতো।

স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হতো, সে তুলনায় মানসিক উন্নতির জন্য সুযোগ ছিল কম। বালকেরা যাতে কাজ ও শ্রম করতে শেখে সে শিক্ষাই তাদের দেওয়া হতো। তাদের জীবন যে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত—সব সময় ঐ ধারণা তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। কুড়ি বছর বয়সে তারা সৈন্যদলে যোগ দিতে ও বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু বিয়ের পর তাদের সামরিক শিবিরে থাকতে হতো। তিরিশ বছর বয়সে তারা নাগরিক অধিকার লাভ করতো ও ঘরে থাকতে পারতো। স্পার্টার মেয়েদেরও কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো। তবে তারা এথেন্সের মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো।

এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সংঘর্ষ ঃ এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সংঘর্ষের প্রধান কারণ ছিল এথেন্সের সাম্রাজ্যের প্রতি স্পার্টার ঈর্ষা। মারাথন ও স্যালামিসের যুদ্ধে পারস্যের দুর্জয় বাহিনীকে পরাস্ত করার পর থেকে এথেন্সের সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। এ সময় পারসিকদের আক্রমণ রুখবার জন্যে গ্রীকরা ঈজিয়ান সমুদ্রের **ডেলস** দ্বীপে একটি শক্তিসংঘ স্থাপন করে। গ্রীসের সমস্ত নগর-রাষ্ট্র ও এশিয়ার গ্রীক উপনিবেশ-গুলিকে এই সংঘে সৈন্য ও জাহাজ দিতে হতো। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রের জাহাজ দিবার সামর্থ্য ছিল না। তারা জাহাজের বিনিময়ে অর্থ দিত। এই সংঘে একশত সত্তরটি রাষ্ট্র অর্থ দিত বলে জানা গিয়েছে। অর্থের পরিমাণ স্থির ও আদায় করার দায়িত্ব ছিল এথেন্সের। এই



পেরিক্লিস

সংঘের কোষাগার প্রথমে ছিল ডেলস দ্বীপে। কিন্তু পারসিকদের আক্রমণের ভয়ে কোষাগারটি এথেন্সে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে এথেন্স সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা গ্রীকরা এথেন্সের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে

মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টার নেতৃত্বে এথেন্সের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তখন দক্ষিণ গ্রীসকে বলা হতো পেলো-পোনেসাস। সেজন্য ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপোনেসাসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩১ অব্দ থেকে সাতাশ বছর ধরে চলে। শেষে স্পার্টার কাছে এথেন্সের পরাজয় ঘটে এবং এথেন্সীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়।

এথেন্সের গৌরবের যুগ ঃ এথেন্সের সাম্রাজ্যের পতন হলেও মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই দেশটির অবদান অপরিসীম। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকে এথেন্সে গণতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের সুযোগ্য নেতৃত্বে এথেন্স সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শীর্ষে পেঁছে। তাই এই যুগকে বলা হয় **পেরিক্লিসের যুগ।**

পেরিক্লিসের পিতা ছিলেন জ্যানথিপ্পাস ও মাতা ছিলেন এক অভিজাত পরিবারের কন্যা। গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক এনাক্সাগোরাস ছিলেন তাঁর শিক্ষক। পেরিক্লিস তিরিশ বছর ধরে এথেন্সের নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর নেতৃত্বে এথেন্স শুধু বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয় নাই, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে গ্রীসের শিক্ষা কেন্দ্রেও পরিণত হয়। তাঁর পৃষ্ঠ-পোষকতায় এথেন্সে বহু দার্শনিক, সাহিতিক ও শিল্পীর সমাবেশ ঘটে। এদের অবদানের ফলে এথেন্স গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পেরিক্লিসের শেষ জীবন মোটেই সুখের ছিল না। এথেন্সবাসীরা পেরিক্লিস, তার পরিবার ও বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা শুরু করে। এর ফলে তাঁর মনোকষ্ট দেখা দেয়। এই অবস্থায় প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দুই পুত্র সহ পেরিক্লিসের মৃত্যু হয় (৪২৯ খ্রীঃ পূঃ)।



সক্রেটিস

সক্রেটিস ঃ পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। এথেন্সের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি মনে করতেন, একজন পরমেশ্বর আছেন, আর তিনিই মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই মানুষের উচিত সেই বুদ্ধি অনুসারে জীবনযাপন করা। কিন্ত মানুষ নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলতে চাইলে সব সময় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলা সম্ভব হয় না। তাই সক্রেটিসের উপদেশ ছিল প্রচলিত রীতিনীতি ও শাসনব্যবস্থার বিরোধী। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁকে

মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর। কারাগারে তিনি হাসিমুখে এক রকম বিষাক্ত পাতার রস 'হেমলক' পান করে মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে গ্রীসের মহামনীষীর জীবন শেষ হয়।

প্লেটো ঃ সক্রেটিসের জীবন শেষ হলেও তিনি তার প্রধান শিষ্য প্লেটোর মধ্যে অমর হয়ে আছেন। সক্রেটিস তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে কোন বই রচনা করেন নি। কিন্তু প্লেটো সক্রেটিসের সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে ডায়লগস্ বা কথোপকথন নামে এক বইয়ে লিখে রেখে গিয়েছেন। এর একটি অংশের নাম রিপাবলিক। একটি আদর্শ রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত তার বর্ণনা এ বইয়ে রয়েছে। তাছাড়া প্লেটো এথেন্সে একাডেমি নামে এক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তার বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন এরিস্টটল। তিনি আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং গুরুর মত তিনিও লাইসিয়াম নামে এক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। কাব্য, ন্যায়, অলংকার রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু বইও রচনা করেন। এই বইগুলি যুগ যুগ ধরে পণ্ডিতদের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।



হেরোডোটাস



থুকিদিদিস

অন্যান্য গ্রীকদের মধ্যে যাঁরা মানুষের চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন এথেন্সের ঐতিহাসিক হেরোডোটাস। তিনিই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার পথ দেখান। তাই তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকে পারসিকদের গ্রীসদেশ আক্রমণের সময় পর্যন্ত গ্রীসের কাহিনী পাওয়া যায়। ঐ যুগের আর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন থুকীদীদস। তিনি তাঁর ইতিহাসে নিরপেক্ষ ভাবে এথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

সাহিত্য ঃ পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাই এদের রচনা এবং শিল্পকার্যের দ্বারা এথেন্স বিশেষ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। পেরিক্লিসের যুগে নাটকে প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়। এই সময় প্রায় আড়াই শত নাটক রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে বত্রিশখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রীস দেশের পৌরাণিক কাহিনীই ছিল এই সকল নাটকের বিষয়বস্তু। কেবলমাত্র এস্‌কাইলাসের পার্সিয়ান্স নাটকখানি ছিল ঐতিহাসিক। এটি পারসিকদের সঙ্গে গ্রীকদের সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। তা'ছাড়া **এস্‌কাইলাস** আরও কয়েকখানি নাটক রচনা করে পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর নাটকগুলি ছিল ট্রাজেডি বা বিয়োগান্তক, তাই তাঁকে ট্রাজেডির জনক বলা হয়। ট্রাজেডি রচনায় এস্‌কাইলাসের পর খ্যাতিলাভ করেন **সফোক্লিস**। তাঁর রচিত সাতখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এর একটির নাম হল আন্তিগোনে। এথেন্সের অপর

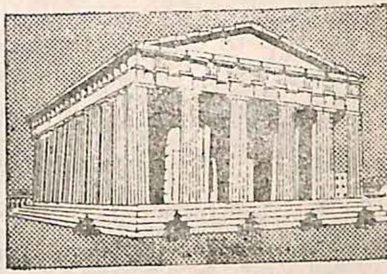


এথেনা দেবীর মূর্তি

একজন নাট্যকার হলেন **ইউরিপিডিস**। তিনি আঠারখানি বিয়োগান্তক নাটক রচনা করেন। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের একমাত্র কমেডি লেখক ছিলেন **এরিস্টোফেনিস**। পার্লামেণ্ট, নাটইস্‌ বার্ড'স প্রভৃতি নাটকে তিনি তখনকার এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনি মোট একান্নখানি নাটক রচনা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

মূর্তি শিল্পী ঃ শুধু সাহিত্য নয়, পাথরের মূর্তি, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণেও পেরিক্লিসের এথেন্স বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এযুগের শ্রেষ্ঠ মূর্তি

শিল্পী ছিলেন পেরিক্লিসের ঘনিষ্ট বন্ধু ফিডিয়াস। তার তৈরী মূর্তির মধ্যে এথেন্সের পার্থিনন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এথেনা দেবীর মূর্তিটি ছিল হাতির দাঁত ও সোনার তৈরী। পরবর্তিকালে প্রাক্সিটিলস্ নামে এক শিল্পীও অনেক মূর্তি তৈরী করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর তৈরী মূর্তিগুলির মধ্যে ওলিম্পিয়া নগরে হেরা দেবীর মন্দিরে স্থাপিত হার্মেসের মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



পার্থিননের মন্দির

স্থাপত্য শিল্প ঃ পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের এ্যক্রোপোলিস নামে পাহাড়ের উপর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে এথেন্সের রক্ষাকর্ত্রী দেবী এথেন্সের সাদা মার্বেল পাথরের মন্দিরটি ছিল স্থাপত্য শিল্পের এক অতুলনীয় নিদর্শন। এই মন্দিরটির নাম পার্থিনন।

এই সকল মূর্তি ও মন্দির থেকে এথেন্সবাসীদের ধর্মজীবনেরও গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায় পেরিক্লিসের শাসনে এথেন্স সব বিষয়ে অভূতপূর্ব গৌরবের অধিকারী হয়।

ম্যাসিডনের উদ্ভব ঃ কিন্তু স্পার্টার সঙ্গে পেলোপোনেসাসের যুদ্ধে এথেন্স শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং গ্রীসে স্পার্টার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে স্পার্টার এই গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কেননা কিছুদিনের মধ্যে থিব্স্ নামে গ্রীসের অপর রাষ্ট্র স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এইভাবে আত্ম-কলহে গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলি দুর্বল হয়ে পড়লে, ফিলিপ নামে এক রাজার নেতৃত্বে গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডন রাজ্যের উদ্ভব হয়। ফিলিপ ম্যাসিডনের দুর্ধর্ষ মানুষদের নিয়ে এক সুসংবদ্ধ সেনাদল গঠন করেন এবং তারই সাহায্যে গ্রীসদেশ জয় করতে সক্ষম হন। আততায়ীর হাতে ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার পিতার এই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পিতা ফিলিপ, মাতা ওলিম্পিয়াস ও গৃহশিক্ষক বিখ্যাত দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের শিক্ষার ফলে যৌবনেই তিনি পৃথিবী ব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি প্রাচ্য

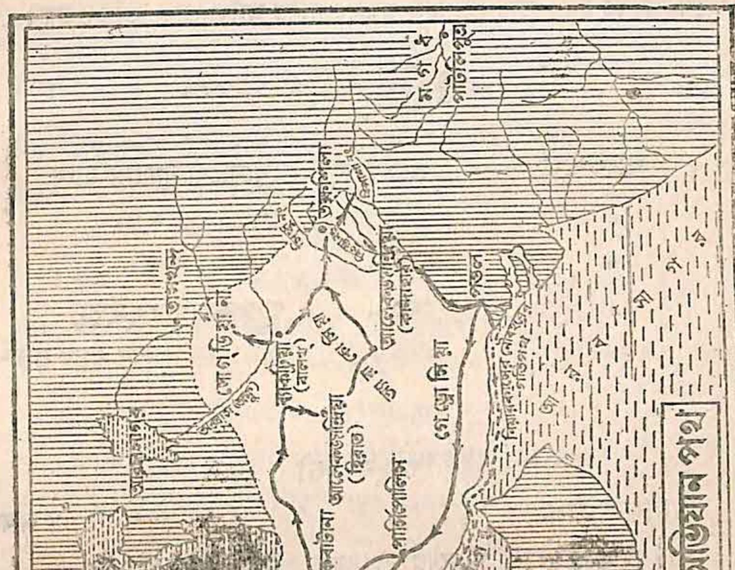
ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের জন্যই দিগিবজয়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন ফিলিপের মৃত্যুর পর গ্রীসের রাজ্যগুলি বিদ্রোহী হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে আরোহণ করেই কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহগুলি দমন করেন। ৩২৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এখানে তক্ষশিলার রাজা অম্ভি সহ অনেক ভারতীয় রাজাই বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা পুরু কাপুরুষের মত বিনাযুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হননি। তাই যুদ্ধ আসন্ন মনে করে আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু পুরুর বিশাল হস্তিবাহিনীর কথা শুনে গ্রীক শিবিরে আতঙ্ক দেখা দেয়। তাই আলেকজাণ্ডার রাতের অন্ধকারে গোপন পথে ঝিলাম নদী পার হয়ে পুরুর রাজ্যে উপস্থিত হন। পুরু তখন আলেকজাণ্ডারকে বাধা দিবার জন্য কিছু সৈন্য দিয়ে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পুরুর পুত্রের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে পুরু তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আলেকজাণ্ডারের মুখোমুখি হন। কিন্তু সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পুরুর পরাজয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রীকদের হাতে বন্দী হন। গ্রীকরা ঝিলাম নদীর নাম দিয়েছিল হিদাস্‌পিস্‌। তাই গ্রীক ভারতীয়দের এই যুদ্ধ হিদাস্‌পিসের বা ঝিলামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। কথিত আছে, বন্দী পুরুকে আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার আশা করেন?" নির্ভীক পুরু উত্তর দেন, "রাজার কাছে রাজার ব্যবহার।" পুরুর এই উত্তরে গ্রীকবীর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন এবং আরও কয়েকটি বিজিত রাজ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।



আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ঃ তারপর আলেকজাণ্ডার পূর্বদিকে বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু বিপাশার পূর্বদিকে নন্দ রাজাদের বিপুল সেনাবাহিনীর কথা শুনে তাঁর ক্লান্ত সেনাদল দেশে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে।

তাই আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশে ফিরতে হয়। ফেরার সময় তিনি তাঁর সেনাদলকে দুইভাগে ভাগ করেন। একদল সেনাপতি নিয়ারকসের অধীনে আরব সাগরের পথে রওনা হয়। আর অপর দল তাঁর নিজের অধীনে স্থলপথে যাত্রা করে।



শেষ পর্যন্ত ব্যাবিলন পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিন্তু সেখানে জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিরা ভাগ করে

নেয়। ভারতসহ পশ্চিম এশিয়ায় দেশগুলি সেলুকাসের ভাগে পড়ে। মিশর পড়ে টলেমির ভাগে, আর গ্রীকসহ ম্যাসিডন পড়ে এণ্টনির ভাগে। দীর্ঘদিন স্বাধীনসত্তা বজায় রাখার পর ১৪৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ম্যাসিডন রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তারপর সমস্ত গ্রীসে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কালপঞ্জী

খ্রীষ্টপূর্ব	৪৩১ অব্দ	পেলোপোনেসাসের যুদ্ধ
"	৪২৯ "	পেরিক্লিসের মৃত্যু
"	৩২৬ "	ঝিলামের যুদ্ধ
"	৩২৩ "	আলেকজাণ্ডারে মৃত্যু
"	১৪৬ "	ম্যাসিডনে রোমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

৯ নম্বর

১। হোমারের যুগে গ্রীকদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল?
২। এথেন্সের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল?
৩। স্পার্টার জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ ছিল?
৪। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের সাহিত্য সম্বন্ধে কি জান?
৫। পেরিক্লিসের যুগের দার্শনিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণ দাও।
৭। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের স্থাপত্য শিল্প ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পের কি জান? [৫+৪]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন

৩ নম্বর

১। গ্রীসদেশের ইতিহাসে ভূগোলের কি প্রভাব লক্ষ্য কর?
২। ইলিয়াড এবং ওডিসির বিবরণ সহ হোমারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩। গ্রীস নগররাষ্ট্র সম্পর্কে কি জান?

৪। ডেলফির দৈববাণী ও অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কিভাবে গ্রীসে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করেছিল?

৫। এথেন্স ও স্পার্টার সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। পেরিক্লিস সম্পর্কে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন **১ নম্বর**

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। গ্রীসের অন্ধ কবির নাম কি?

২। হোমারের রচিত বই দু'খানির নাম কি?

৩। গ্রীক দেবতাদের রাজার নাম কি?

৪। এথেন্স নামটির উদ্ভব কোথা থেকে হয়েছে?

৫। ডেলফি নগরীতে কোন্ দেবতার মন্দির ছিল?

৬। গ্রীকদেবতা জিউসের মন্দির কোথায় ছিল?

৭। স্পার্টার শিক্ষা-সংক্রান্ত নিয়মকানুন কে প্রবর্তন করেন?

৮। কোন্ যুদ্ধে গ্রীকরা পারসিকদের পরাজিত করে?

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। — বলা হয় গ্রীসের মহাকবি।

২। — ছিলেন গ্রীকদের জ্ঞানের দেবী।

৩। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্সের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন —।

৪। এথেন্সের ঐতিহাসিক — কে ইতিহাসের জনক বলা হয়?

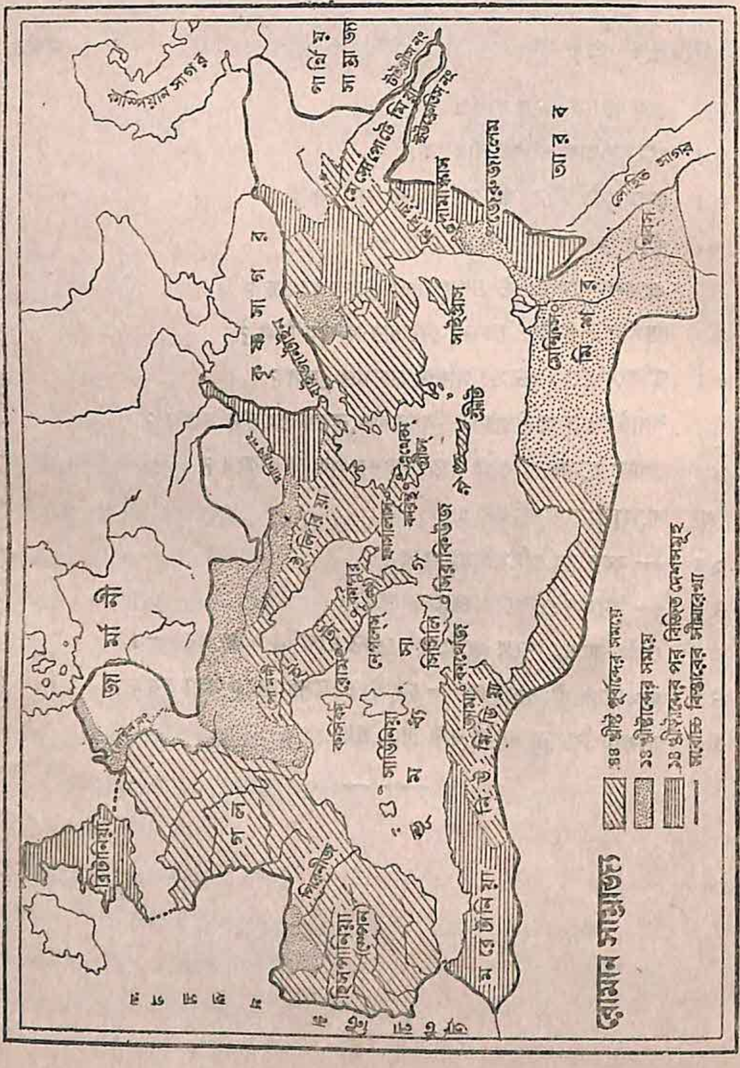
৫। গ্রীকরা ঝিলাম নদীর নাম দিয়েছিল —।

অধ্যায়

৭

রোমের কথা

রোম নগরীর উৎপত্তি ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রীকদের মত রোমানদেরও



গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। রোমানরা ছিল ইতালীর টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত নগরীর অধিবাসী। খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে রমুলাস এবং

রেমাস্ নামে দুই ব্যক্তি টাইবার নদীর তীরে একটি নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্যেষ্ঠ রমুলাসের নাম অনুসারে তার নাম হয় রোম। রোমের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, রমুলাসের মাতামহকে বন্দী করে তাঁর ছোট ভাই রমুলাস ও রেমাস্‌কে নদীর জলে নিক্ষেপ করে। কিন্তু দৈবক্রমে শিশু দুইটির প্রাণ রক্ষা পায় এবং একটি নেকড়ে নিজের দুধ খাইয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখে। বড় হয়ে রমুলাস্ ও রেমাস্ নিজেদের পরিচয় জানতে পারে। এরপর তারা মাতামহকে পুনরায় সিংহাসনে বসায় ও রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করে। রেমাসের মৃত্যু হলে রমুলাস রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় থেকে ৫১০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সাত জন রাজা পর পর রাজত্ব করেন। কিন্তু শেষ রাজা ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তাঁর কুশাসনের জন্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় এবং প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

রোম কার্থেজ সংঘর্ষ ঃ প্রজাতন্ত্র-শাসিত রোমের ইতিহাস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষ। কার্থেজ ছিল ফিনিসিয়দের একটি উপনিবেশ। ফিনিসিয়রা ব্যবসার প্রয়োজনে ভূমধ্যসাগরে সিসিলি, কর্সিকা, সার্ডেনিয়া প্রভৃতি দ্বীপে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইতিমধ্যে রোমও সমগ্র ইতালিতে তার প্রভুত্ব স্থাপন করায়, উভয়পক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।


হ্যানিবল

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ ঃ শক্তিশালী কার্থেজকে দমন করার জন্য রোমকে তিনটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধগুলি পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রথমযুদ্ধটি সংঘটিত হয় সিসিলি দ্বীপে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোম এই যুদ্ধে জয়ী হয় এবং স্বীয় অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু কার্থেজ সিসিলির উপর তাদের অধিকার চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া ইতিমধ্যে রোম, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়াও দখল করে নিয়েছিল। এই সময়

কার্থেজবাসীরাও তাদের সুযোগ্য নেতা হামিলকার বার্কারের পুত্র হ্যানিবল স্পেনের অন্তর্গত একটি নগর আক্রমণ করে। ঐ নগরটি ছিল রোমের মিত্র রোমানরা তাদের মিত্রের সাহায্যে এগিয়ে এলে রোম-কার্থেজের সংঘর্ষ পুনরায় শুরু হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত।

হ্যানিবলের নেতৃত্ব ঃ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের নেতা ছিলেন হ্যানিবল। তিনি ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। যাই হোক, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শুরু হলে হ্যানিবল তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পিরেনিজ ও দুর্ভেদ্য আল্পস পর্বত অতিক্রম করে স্থলপথে ইতালীতে উপস্থিত হন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ইতালীর কাপুয়া নগরে শিবির স্থাপন করেন। রোমের এই বিপদের দিনে সিপিও পাবলিয়াস নামে এক রোমান সেনাপতি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে কার্থেজে উপস্থিত হলে, সেখানকার শাসকরা ভয় পেয়ে হ্যানিবলকে কার্থেজে আনার নির্দেশ দেয়। কার্থেজে ফিরে এসে হ্যানিবল জামার যুদ্ধে রোমের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হন। তবে রোম তাঁর আত্মসমর্পণের দাবি জানালে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ ঃ জামার যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কার্থেজের সঙ্গে রোমের শেষ বা তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সময় ক্যাটোর নেতৃত্বে একদল রোমান নাগরিক কার্থেজ ধ্বংসের দাবী জানাতে শুরু করে। জামার যুদ্ধে বিজয়ী সিপিওর ভাইয়ের পৌত্র এমীলিয়ানা সিপিও এই যুদ্ধে রোমানদের নেতৃত্ব দেন। এইভাবে পর পর তিনটি যুদ্ধে জয়লাভ করায় পশ্চিম ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোমের একচেটিয়া অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন রোমের সমাজ ব্যবস্থা ঃ শুধু মাত্র যে রোমের রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা নয়, প্রাচীন রোমানদের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তারা কৃষি ও পশুপালন করেই জীবিকা অর্জন করতো। কেউ শণ বা পশম কাপড় বুনতো। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত তারা মুদ্রার ব্যবহার জানতো না। তবে পরে তারা ব্রোঞ্জের মুদ্রার সাহায্যে লেনদেন করতো। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্তা হিসাবে পিতাই ছিলেন সর্বেসর্বা। রোমানরা গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে তারা গ্রীক দেবদেবীকেও তাদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান ঃ প্রাচীনকালে রোমানরা প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশের লোক বলে প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল

রাষ্ট্র ও সমাজের সকল সুযোগের অধিকারী। অপরদিকে প্লেবিয়ান সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধারণ নাগরিকদের কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। এমনকি তারা ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ফলে প্যাট্রিসিয়ানরা তাদের দাবি দাওয়া স্বীকার করে এবং তাদের ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করে বিভিন্ন আইন পাশ করে। জমিজমা-সংক্রান্ত নিয়মগুলিরও সংশোধন করে।

রোমের নাগরিকত্ব ঃ জাতীয় সংহতি স্থাপনে সকল শ্রেণীর লোককে নাগরিক অধিকার দান ছিল রোমের ইতিহাসেরঅন্যতম বৈশিষ্ট। গ্রীকরা তাদের সাম্রাজ্যের সকল লোককে নাগরিক অধিকার না দিয়ে সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু এদিক দিয়ে রোমানরা যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেয়। তারা খ্রীষ্টপূর্ব ৯০-৮৯ অব্দে ইতালীতে গৃহযুদ্ধের পর রোমানগণ সকল লোককেই নাগরিক অধিকার দান করে।



রোমের বিভিন্ন শ্রেণী

ক্রীতদাস প্রথা ও দাস বিদ্রোহ ঃ রোমানরা সকল শ্রেণীর লোককে নাগরিক অধিকার দিয়ে উদারতার পরিচয় দিলেও ক্রীতদাসের প্রতি ব্যবহারে তারা ছিল অত্যন্ত নির্মম। বিভিন্ন যুদ্ধে বন্দী হিসাবে যাদের রোমে আনা হতো, তাদেরই ক্রীতদাসে পরিণত করা হতো। রোমের যাবতীয় গৃহকর্ম চাষ-আবাদ, শিল্প সবই এইসব ক্রীতদাসের শ্রমের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। যারা গৃহস্থের বাড়িতে দাস হিসাবে কাজ করতো, তারা সহৃদয় ব্যবহার পেতো। কিন্তু যারা খনি. বাগিচা প্রভৃতিতে কাজ করতো তাদের ভাগ্যে জুটতো নির্মম অত্যাচার। কেউ তার প্রভুকে হত্যার চেষ্টা করলে তাকে ক্রুশে বিঁধিয়ে মেরে ফেলা হতো। এভাবে অত্যাচারের ফলে ক্রীতদাসদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাই ৭৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নামে থেসালীর এক মল্লযোদ্ধার নেতৃত্বে এই



স্পার্টাকাস

অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরাজয় ঘটে এবং তাঁর ছয় হাজার সঙ্গীকে রোমের রাস্তায় ক্রুশবিদ্ধ করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ক্রীতদাসের মুক্তি আন্দোলন এভাবে ব্যর্থ হলেও রোমানরা বুঝতে পারে, যে সমাজে অধিকাংশ লোককে অবহেলা করা হয় সেই সমাজে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই প্রজাতন্ত্রের যুগে, পূর্বে এশিয়া উত্তরে রাইন এবং পশ্চিমে ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত রোমের যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়তে শুরু করে।

রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন ঃ শুধুমাত্র গণ অসন্তোষের জন্যেই যে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল তা নয়। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করাও রোম সরকারের পক্ষে ছিল খুবই দুরূহ। এই সুযোগে রোমের কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা করেন। এই রকম একজন নেতা ছিলেন **জুলিয়াস সীজার**। খৃষ্টপূর্ব ১০০ অব্দে রোমের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন সুদক্ষ সেনানায়ক এবং তার সংগঠন প্রতিভাও ছিল আসাধারণ। তাঁর শত্রুদের পরাস্ত করে তিনি রোমে প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের বিপদ লক্ষ্য করে তাঁর স্নেহভাজন ব্রুটাস তাঁকে হত্যার ব্যবস্থা করেন।

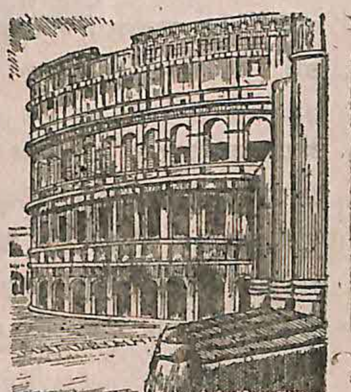


জুলিয়াস সীজার

সিজারের মৃত্যুতে যে বিশৃঙখলার সৃষ্টি হয় তাঁর পোষ্যপুত্র অক্টোভিয়ান তা দূর করেন। তিনি ৩১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনিই হলেন রোমের প্রথম সম্রাট। ইতিহাসে অক্টোভিয়ান সম্রাট অগাস্টাস নামে পরিচিত। তাঁর

আমলে শিক্ষা ও সাহিত্যে এত অভূতপূর্ব উন্নতি হয়ে যে, তাঁর রাজত্বকাল রোমের ইতিহাসে 'সুবর্ণযুগ' নামে খ্যাত। এই যুগেরই বিখ্যাত কবি ছিলেন **ভার্জিল, হোরেস ও ওভিদ**। আর লিভি ছিলেন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশ থেকে রোমে নানারকম জিনিস আমদানি হতে থাকে। রোমের মত শোভা ও ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যের আর কোন শহরে ছিল না। রোমে এখনও যেসব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। রোমের নাগরিকরা বিচার প্রভৃতি কাজের জন্য যেখানে মিলিত হতেন তাকে **ফোরাম** বলে। জুলিয়াস সীজার একটি নতুন ফোরাম তৈরি করেন। রোমানরা গ্রীকদের রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে অ্যাম্পিথিয়েটার নির্মাণ করে। রোম নগরের মাঝখানে খেলাধুলার জন্য নির্মিত গোলাকার **কলোসিয়াম** ছিল সে যুগের স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন। ঘেরা জায়গায় সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর সঙ্গে খালি হাতে ক্রীতদাস বা মল্লযোদ্ধার যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ট্র্যাজানের বিজয় স্তম্ভ ও সম্রাট কনস্টানণ্টাইনের বিজয় তোরণ এখনও স্থাপত্য শিল্পে রোমানদের উন্নতির পরিচয় দেয়।



কলোসিয়াম

অগস্টাসের পরে অনেক সম্রাট রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ। ডায়োক্লিশিয়ান ছিলেন বিচক্ষণ শাসক। কনস্টানটাইন ছিলেন শেষ সুযোগ্য সম্রাট। কিন্তু সম্রাট নীরো, কমোডাস প্রভৃতি অনেকেই খামখেয়ালী শাসক ছিলেন।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন: চরিত্রবল, সামরিক শক্তি হ্রাস, বিভিন্ন দাবিদারের সংখ্যাও রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে অনেকাংশে দুর্বল করে দেয়। সেজন্য বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে গথ, টিউটন, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর জাতি রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালিয়ে এর পতন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ওডোয়াসার-এর নেতৃত্বে টিউটনরা শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস

অগাস্টাসকে সিংহাসনচ্যুত করে। এইভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার ঃ যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন পশ্চিম এশিয়ার জুডিয়া রাজ্যের অধিবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন যোসেফ ও মাতা ছিলেন মেরী। জেরুজালেমের নিকট বেথেলহেম শহরের এক আস্তাবলে যীশুর জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। যীশুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যীশু ছেলেবেলায় লেখাপড়া করার বিশেষ সুযোগ পান নি। তাঁকে কিছুদিন ছুতারের কাজ করতে হয়। সেকালে ইহুদীদের মধ্যে বহু ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের মধ্যে জন অন্যতম। তিনি বলতেন, পাপের জন্য অনুতাপ করলে ও পবিত্রভাবে জীবন কাটালে ঈশ্বর করুণা করেন। জনের কাছে যীশুর বালক বয়সে দীক্ষা হয়। এরপর যীশু "সকল মানুষ পরস্পরের ভাই"—এই বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। যীশুর সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও বাণী নিপীড়িত মানুষদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। তাই অবহেলিত মানুষেরা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁকে খ্রীষ্ট বা ত্রাণকর্তারূপে বরণ করে নেয়। কিন্তু রোমের শাসনকর্তারা তাঁর এই জনপ্রিয়তায় খুবই ভীত ও শঙ্কিত হয়ে উঠেন এবং মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। 'চুরি না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, কাউকে না ঠকানো পিতামাতাকে ভক্তি করা, সত্য কথা বলা, সৎ জীবন যাপন করা প্রভৃতি ছিল যীশুর বাণী।

পল নামে যীশুর এক শিষ্য পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, এমনকি রোম পর্যন্তও যীশুর বাণী প্রচার করেন। এই সময় থেকেই দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ যীশুর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। রোমের সম্রাটরা খ্রীষ্টের উপাসক ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করতে থাকেন তবুও জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে যীশুর মৃত্যুর প্রায় তিন শত বছর পরে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্‌ নিজে এই ধর্ম গ্রহণ করায় ঐ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্‌-এর (৩০৬ খ্রীঃ অঃ—৩৩৭ খ্রীঃ অঃ) নাম রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। তিনি তাঁর রাজধানী রোম থেকে এশিয়ার বাইজান্টিয়ামে স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। বৈদেশিক আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম

অংশের পতন ঘটলেও প্রায় এক হাজার বছর কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলের রোমান সাম্রাজ্য টিকে ছিল।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ৯নম্বর

১। কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। প্রাচীন রোমের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? এই প্রসঙ্গে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সংগ্রামের বিবরণ দাও। [৫+৪]

৩। প্রাচীন রোমের ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর। [৫+৪]

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন ৩ নম্বর

১। রোম নগরীর উৎপত্তির গল্পটি সংক্ষেপে লেখ।

২। স্পার্টাকাস সম্বন্ধে কি জান?

৩। কিভাবে রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন হয়?

৪। সভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের কি কি অবদান আছে?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ১ নম্বর

(ক) ১। রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?

২। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে ফিনিসীয়দের উপনিবেশের নাম কি?

৩। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যে যুদ্ধ হয় তার নাম কি?

৪। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ এবং রোমের নেতা কে ছিলেন?

৫। রোমে দাস বিদ্রোহীদের নেতা কে ছিলেন?

৬। অগাস্টাস উপাধি কে গ্রহণ করেছিলেন।

(খ) নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন দাও।

১। রোম নগর প্রতিষ্ঠিত হয়—৭০৫ খ্রীঃপূঃ /৭৫৩ খ্রীঃ পূঃ/৮২৫ খ্রীঃ পূঃ।

২। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল—৪২৩ খ্রীঃ অঃ/৪৭৬ খ্রীঃ অঃ/৩৭৬ খ্রীঃ অঃ।

———

অধ্যায়

৮

চীনদেশের কথা

চীন দেশের ইতিহাস পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। চৌবংশের রাজত্বকালে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সমস্ত প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।

আদিম যুগে চীন কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পরে চীনের প্রায় সর্বত্র জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র শাসন। প্রাচীন চীনে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করতেন। চীনের প্রাচীন পুঁথিপত্রে প্রাচীনতম রাজবংশ হিসেবে সাঙ বংশের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুগের অধিবাসীরা লিখতে পড়তে জানত। ব্রোঞ্জের পাত্রের গায়ে সূক্ষ্ম সুন্দর নকশা আঁকতে পারত। কৃষি ও পশুপালন ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। পশমের ব্যবহার এদের জানা ছিল। এই যুগের বহু রাজপ্রাসাদ দুর্গ এবংমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সাঙ রাজবংশ পাঁচশ' বছর, খৃঃ পূঃ ১৫২৩-১০২৭ অব্দ) রাজত্ব করেছিল। সাঙ বংশের পর শুরু হয় চৌ রাজবংশের শাসন। চৌ বংশ চীনে প্রায় আটশ' বছর রাজত্ব করে।



চীনের নকশা করা পাত্র

কন্‌ফুসিয়াস ঃ চৌ-রাজাদের রাজত্বকালে কন্‌ফুসিয়াস নামে একজন দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মতই তিনি মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে চেষ্টা করেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। সেজন্য প্রথম বয়সে তিনি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। তবে সংগীত এবং



কন্‌ফুসিয়াস

ধনুর্বিদ্যা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি নাকি দেখতে কদাকার ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর ছিল পবিত্র ও সুন্দর। তাঁর চীনা নাম 'কুং-ফু-জি'।

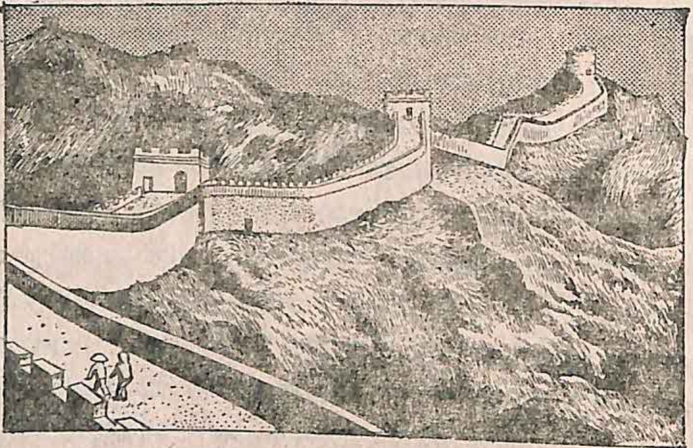
কনফুসিয়াস দেখলেন চৌ রাজবংশের দুর্বল শাসনে চীনের সর্বত্র অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করেছে। তার উপর ছিল উত্তর দিক থেকে বর্বর জাতির আক্রমণ। তাদের অত্যাচার ও লুঠতরাজের ফলে লোকের দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। কনফুসিয়াস গভীরভাবে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পেঁছালেন যে, দেশের লোকের নৈতিক অধঃপতনই এই দুঃখের কারণ। তাই তিনি বাইশ বছর বয়সে নৈতিক শিক্ষা প্রচারের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক গাথা আর শালীনতা—এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। 'লু' নামক রাজ্যের রাজা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন! তখন তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত করেন। ধনী দরিদ্র প্রতিটি মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন-যাপনের জন্য অনেক আইন প্রচলন করেন এবং ধনী-দরিদ্র সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থায় ধনীরা অসন্তুষ্ট হয় এবং তাকে মন্ত্রিপদ থেকে অপসারিত করে। তখন তিনি শিষ্যদের নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে তাঁর মতামত প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

এই পৃথিবীতে মানুষ কি করে মহৎ হতে পারে, এই শিক্ষাই কনফুসিয়াস দিয়েছেন। তিনি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রত্যেকের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং প্রজাদের রাজাকে মেনে চলতে, আর রাজাকে প্রজাদের সন্তানের মত পালন করতে বলতেন। তিনি শুকিং নামে চীনদেশের একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখে গেছেন।

চিন রাজবংশ ঃ চৌরাজ বংশের পর চিন রাজবংশ চীনে রাজত্ব করে। চিন রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন শি হুয়াংতি। তিনি সমগ্র চীনকে তাঁর শাসনাধীনে আনেন। দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নানা প্রকার সংস্কার করেন।

চীনের উত্তর দিক থেকে হূণ ও তাতার প্রভৃতি বর্বর জাতিরা এসে প্রায়ই লুট-পাট করত। চীন সম্রাট শি-হুয়াংতি তাদের প্রতিরোধ করার জন্য প্রায় দেড় হাজার মাইল বিস্তৃত প্রাচীর নির্মাণ করেন। এটি এত চওড়া যে, তার উপর দিয়ে ছ-জন অশ্বারোহী পাশাপাশি ছুটে যেতে পারতো। আনুমানিক ২১৪ খৃীঃ পূর্বাব্দে প্রাচীরটির নির্মাণ শুরু হলেও শেষ হতে কয়েক শ' বছর লেগে যায়। এই প্রাচীরই রাজা শি-হুয়াতির সবচেয়ে বড় কীর্তি এবং আজও পৃথিবীর এক আশ্চর্যের বস্তু।

চীন বংশের রাজত্বকালে অনেক লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়। লোহার হাতিয়ার দিয়ে খাল কেটে জলসেচের ব্যবস্থা হয় এবং কৃষিসংস্কারের ফলে চীন সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই বংশের রাজত্বকালে এক মন্ত্রী চীনের বিভিন্ন



চীনের মহাপ্রাচীর

অঞ্চলের লিপিকে নিয়ে এক সাধারণ লিপিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু করভারে জর্জরিত প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে চীন রাজবংশের পতন হয়।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

৯ নম্বর

১। শাঙ্-বংশের বিবরণ দাও।
২। চৌ-বংশের সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। কনফুসিয়াস সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪। কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মমত কি?
৫। চীন বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন

৩ নম্বর

১। শাঙ্ বংশের কতজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন।

২। শাঙ্ বংশের পরবর্তী রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। কনফুসিয়াসের চীনা নাম কি ছিল? তাঁর বাল্যকাল সংক্ষেপে আলোচনা কর। [১+২]

৪। কনফুসিয়াসের শিক্ষাকেন্দ্রে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো? কনফুসিয়াসের শিক্ষানীতি আলোচনা কর। [১+২]

৫। 'লু' রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কনফুসিয়াসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। চিন রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন? তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি?

৭। চীনের প্রাচীর নির্মাণের কারণ কি?

[১+২]

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১ নম্বর

শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। শাঙ্ রাজত্বের পর চীন — রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। — ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী দার্শনিক।

৩। চীনা ভাষায় কনফুসিয়াসের নাম —

৪। — চীনের প্রাচীর নির্মাণ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

———

অধ্যায়

১

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা

(ক) **আর্য জাতি ও বৈদিক সভ্যতা ঃ** সিন্ধু-সভ্যতার পর ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের নাম অনুসারে এই সভ্যতার নাম হয় বৈদিক সভ্যতা। প্রাচীন কালে একটি ভাষা প্রচলিত ছিল, পণ্ডিতগণ এর নাম দিয়েছেন আর্য ভাষা। আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহ যে একই মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

আর্যরা প্রথমে কোথায় বাস করত তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, তারা মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কোন এক অঞ্চলে বাস করত। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ক্রমে তারা এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় চার হাজার বছর আগে (২000 খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এদের একটি শাখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এখানকার আদিম অধিবাসী অনার্যদের তীব্র প্রতিরোধ চূর্ণ করে আর্যগণ সপ্তসিন্ধু বা সাতটি নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই সাতটি হলো সিন্ধু, বিতস্তা বা ঝিলাম, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু, এবং সরস্বতী। অনার্যদের ঋগ্বেদে দাস বা দস্যু আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দাসগণ ছিল খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বনাসা। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যগণ ক্রমশ সপ্ত-সিন্ধুর পূর্বে ও দক্ষিণে ক্ষমতা ও সভ্যতা বিস্তার করে। আর্যসভ্যতার কেন্দ্র এর পরে সপ্তসিন্ধু থেকে সরস্বতী ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী 'মধ্যদেশে' স্থানান্তরিত হয়। আর্যদের মতে মতে বেদ অপৌরুষের এবং নিত্য। বহু প্রাচীন কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অণুপ্রেরণায় এই বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন এবং পুরুষ পরম্পরায় বেদ মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। এইজন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। আর্যদের এই প্রাচীনতম সাহিত্য আনুমানিক ২৫00 খৃঃ পূঃ থেকে ৫00 খৃঃ পূঃ-এর মধ্যে রচিত হয়েছিল।

বেদ ঃ আর্যদের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদ চারটি, যথা—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদে আবার—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চার ভাগে বিভক্ত। সংহিতায় দেবদেবীর প্রার্থনার মন্ত্র ও স্তবস্তুতি এবং ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞের বিধিগুলি

লেখা আছে। আরণ্যকে আছে তপস্যা, ধ্যান, উপাসনা প্রভৃতির নির্দেশ আর উপনিষদে আছে ভগবৎ চিন্তার সুন্দর আলোচনা।

বৈদিক সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে বেদের বিষয়বস্তুকে সরল ও সংক্ষিপ্ত-ভাবে আলোচনা করে সূত্র সাহিত্য লেখা হয়। সূত্র-সাহিত্যের প্রধান শাখা হলো বেদাঙ্গ বা স্মৃতি।

আর্যদের ধর্ম ঃ আদি বৈদিক যুগে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ সরল। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে তারা বহু দেবদেবী জ্ঞানে উপাসনা করত। ঋগ্বেদীয় যুগে বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, আকাশ ও জলের দেবতা বরুণ, আলোর দেবতা সূর্য, ঝড়ের দেবতা মরুৎ, পৃথিবীর দেবতা অগ্নি ছিলেন এদের মধ্যে প্রধান। এইসব দেবতার উদ্দেশ্যে আর্য মুনি-ঋষিরা অনেক স্তোত্র বা মন্ত্র রচনা করেন। বহু দেবদেবীর পূজা করলেও আর্যরা উপলব্ধি করেছিলেন, সকল দেবতা একই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অঙ্গ।

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন ঃ বৈদিক যুগে আর্যদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হতো একটি গ্রাম এবং গ্রামের সমষ্টিতে গঠিত হতো বিশ বা জন। গ্রামের প্রধানকে **গ্রামণী** এবং বিশ বা জনের প্রধানকে **বিশপতি** বা **রাজন** বলা হতো। রাজাই ছিল রাজ্যের সর্বময় কর্তা। রাজ্যের প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হতো **সভা**। আর **সমিতি** ছিল জনসাধারণের সংস্থা। এছাড়া **গ্রামণী**, **সেনানী**, **পুরোহিত** প্রভৃতি কর্মচারীর সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। সমাজে পুরোহিতের স্থান ছিল খুবই উচ্চে। তিনি রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাগ-যজ্ঞ করতেন। সৈন্যদলে পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এরা তীর, ধনুক, বল্লম, তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতো।

আর্যদের সামাজিক জীবন ঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের মতো আর্যদের ব্যক্তি-জীবনের ভিত্তি ছিল পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার। পরিবারের প্রধানকে বলা হতো **গৃহপতি**। পরিবারে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও মেয়েরা বিশেষ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। পুরুষদের বহুবিবাহ করার অধিকার ছিল। মেয়েরা ঘরের বাইরে নানা কাজে পুরুষদের সাহায্য করতেন।

ঋক্‌বেদ থেকে জানা যায়, **অপালা**, **ঘোষা**, **বিশ্ববারা**, **লোপামুদ্রা**, **গার্গী**, **মৈত্রেয়ী** প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ পুরুষদের সাথে রাজনীতি, ধর্ম এবং শাস্ত্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।

প্রাচীন আর্যদের জীবন সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। দুধ, ঘি, গম, যব, মাংস ও ফলমূল ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। আর্যগণ সুতা-পশম ও চামড়ার পোশাক পরতো। আর্যদের আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মৃগয়া, রথচালনা, পাশাখেলা, নাচ গান প্রভৃতি ছিল খুব প্রিয়।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা ছিল না বলেই মনে হয়। তখনকার সমাজে ছিল গৌরবর্ণ আর্যজাতি ও কৃষ্ণবর্ণ অনার্য জাতি। কিন্তু ক্রমে জীবিকার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিটি জাতির উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র আলোচনা ও পূজা, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ, বৈশ্যগণ, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি এবং শূদ্রগণ উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ভৃত্য হিসাবে কাজ করে জীবনযাপন করত।

বৈদিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল **চতুরাশ্রম**। এই আশ্রম **ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস** এই চারটি ভাগে বিভক্ত ছিল। বাল্যকালে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ ছিল 'ব্রহ্মচর্য' পালনের উদ্দেশ্য। যৌবনে সংসার ধর্ম পালনই ছিল 'গার্হস্থ্য' আশ্রমের কর্তব্য। প্রৌঢ় বয়সে 'বানপ্রস্থ' এবং শেষ বয়সে 'সন্ন্যাস' ধর্মচর্চা। ছিল অবশ্য পালনীয়।

বৈদিক যুগে আর্যরা গ্রামে বাস করতো। চাষবাস ও পশুপালন ছিল এদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এছাড়া ছুতোর ও কুমোরের কাজ, ধাতুর গহনা ও পাত্র তৈরীর কাজও তারা করতো। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রচলন ছিল।

(ক) **মহাকাব্য** ঃ বৈদিক যুগের শেষদিকে **রামায়ণ** ও **মহাভারত** নামে দুটি মহাকাব্য রচিত হয়। রামায়ণ রচনা করেন মহাকবি বাল্মীকি, আর ঋষি **ব্যাসদেব** রচনা করেন মহাভারত। রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে ভগবানের অবতার। রামায়ণ ও মহাভারত শুধু মহাকাব্য নয়। এর মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। এই কাব্য দুটির কাহিনীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে লেখা বহুকাব্য ও সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। রামায়ণ-মহাভারত তাই ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।

(গ) **জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব** ঃ বৈদিক যুগের শেষদিকে ধর্মীয় জীবনে সংকীর্ণতা ও নানা গলদ দেখা দেয়। ধর্ম-ব্যবস্থা তখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠার বদলে যাগযজ্ঞ,

পশুবলি এবং ব্যয়বহুল বিধি ব্যবস্থা ছিল ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এইসব প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপে সাধারণ লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়। ফলে ধর্ম আন্দোলন দেখা দেয় এবং নূতন নূতন ধর্মমতের উদ্ভব হয়।

জৈনধর্ম ঃ জৈনধর্ম প্রচার করেন মহাবীর। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে উত্তর বিহারের বৈশালীতে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। তাঁর বাবার নাম ছিল সিদ্ধার্থ, আর মায়ের নাম ত্রিশলা। স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা। মহাবীর তিরিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করেন। তখন তিনি জিন্ বা জয়ী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় হতে তাঁর নাম হয় মহাবীর। এরপর দীর্ঘ তিরিশ বছর ভারতের নানাস্থানে ধর্মমত প্রচার করার পর ৭২ বছর বয়সে বিহারের পাবা নগরে (অধুনা পাটনায়) তিনি দেহত্যাগ করেন। মহাবীর যে ধর্মমত প্রচার করেন তা জৈনধর্ম নামে পরিচিত। তিনি বলতেন, "কাকেও হিংসা করবে না, পরের দ্রব্যে লোভ করবে না, মিথ্যা কথা বলবেনা এবং সংসারের প্রতি আসক্তি না রেখে সকল অবস্থায় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ পালন করে চলবে।"

মহাবীর যাগযজ্ঞের প্রয়োজন স্বীকার করতেন না। তাঁর মতে ভগবানকে লাভ করার জন্য বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান সবই নিরর্থক। উপনিষদের কর্মবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা অহিংসা-নীতি পালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে তারা হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ বলে বিবেচনা করতেন। জৈনদের মতে মহাবীরের আগে আরও তেইশ জন ধর্মগুরু তীর্থংকর এই ধর্মমত প্রচার করেন। মহাবীর ছিলেন চব্বিশতম বা শেষ তীর্থংকর।

বৌদ্ধধর্ম ঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক। নেপালের কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী উদ্যানে তাঁর জন্ম। শাক্যবংশের রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন তাঁর বাবা এবং মায়াদেবী ছিলেন মা। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তাঁকে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য গোপা নামে এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। তবুও তিনি সংসারের মায়ায় বাঁধা পড়েননি। এ সময় সৌম্য এক সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর মনে শান্তির উদয় হয় এবং এক গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন।

গৃহত্যাগের পর তিনি গয়ার নিকট উরুবিল্বে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। কিন্তু এতে সিদ্ধিলাভ হলো না। তাই তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করে গয়ার কাছে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। এখানে দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যার পর তিনি বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ বা জ্ঞানী উপাধি লাভ করেন। তার এই উপাধি অনুসারে তাঁর ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম, তার তপস্যার স্থান বুদ্ধগয়া আর অশ্বত্থ গাছটি বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত লাভ করে।

বুদ্ধদেব কাশীর নিকটে সারনাথ নামক স্থানে প্রথমে ধর্মপ্রচার করেন। তিনি বলেন, বেশী সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা ভাল না। শরীরকে অনর্থক কষ্ট দিয়েও লাভ নেই। এ দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করা উচিত। তাঁর মতে বাসনা থেকেই দুঃখ। বাসনা দূর করা যায় অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথ অনুসরণ দ্বারা— সম্যক দৃষ্টি, সৎসংকল্প, সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎজীবন, সৎচেষ্টা সংস্কৃতি ও সম্যক সমাধি। এই অষ্টমার্গের অনুসরণ করলে মানুষের আর দুঃখ থাকে না। বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ ছিল কোন প্রাণীকে হিংসা করবে না। অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করবে। ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে বিম্বিসারের মত রাজা অনাথপিণ্ডদ-এর মত ধনী আবার আনন্দ ও উপালির মত দীন-দরিদ্রও ছিল। শিষ্যদের মধ্যে ঐক্যবৃদ্ধির জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মও স্থাপন করেন। অবশেষে আশী বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে তাঁর মহাপরিনির্বাণ ঘটে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ : বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যগণ রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহায় মিলিত হয়ে তাঁর উপদেশগুলি তিনটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বৌদ্ধদের এই ধর্মগ্রন্থগুলির নাম ত্রিপিটক। জাতক নামে আর এক প্রকার সাহিত্যে বুদ্ধদেবের পুনর্জন্মের কাহিনী বর্ণিত আছে।

সম্রাট অশোকের আনুকূল্য লাভের পর বৌদ্ধধর্ম ভারতে ও ভারতের বাইরে বহুল প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

(ঘ) সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান

মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন

মৌর্য সাম্রাজ্য : খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ষোলটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এদের ষোড়শ মহাজনপদ বলা হতো। এগুলির মধ্যে একটি

রাজ্য ছিল মগধ। বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলা জুড়ে মগধ দেশ বিস্তৃত ছিল। মৌর্যবংশের আগে এখানে নন্দবংশ রাজত্ব করতো। নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দের অত্যাচারে প্রজাগণ খুব অসন্তুষ্ট ছিল। তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক যুবক চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক তীক্ষ্মবুদ্ধি ব্রাহ্মণের সাহায্যে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে ধননন্দকে পরাজিত করেন এবং মগধের সিংহাসন দখল করেন (আনুমানিক ৩২৪ খ্রীঃ পূঃ)। চন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ মৌর্যবংশ নামে পরিচিত।

সিংহাসন লাভের পর চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ মহীশূরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ থেকে তিনি গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, বেলুচিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশও তাঁকে ছেড়ে দেন। ফলে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য ভারতের বাইরেও বিস্তৃত হয়।

পাটলিপুত্র নগর (বর্তমান পাটনা) ছিল সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী। নগরটি কাঠের প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। রাজ্য রক্ষার জন্য চন্দ্রগুপ্তের বিরাট সৈন্যবাহিনী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যে কৌটিল্যের সহায়তায় এক শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ২৯৯ খ্রীঃ পূঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

বিন্দুসার (খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ অব্দ): চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সময়ে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের সাথে ভারতের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭০-২৩২ অব্দ): বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যলাভের কয়েক বছর পরেই তিনি কলিঙ্গ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) দেশ জয় করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড তাঁকে ব্যথিত করে এবং তিনি আর যুদ্ধ না করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতের চোল, পাণ্ড্য, কেরল, সত্যপুত্র প্রভৃতি রাজ্য এবং ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণদ্বীপ, মিশর, গ্রীস, সিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যে অশোক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কথিত আছে, তাঁর নিজের পুত্র

মহেন্দ্র (কারো মতে ভ্রাতা) ও কন্যা সংঘমিত্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে গিয়েছিলেন।

রাজ্যশাসনেও অশোক ছিলেন আদর্শ রাজা। প্রজাদের তিনি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। তাদের মধ্যে যাতে ধর্মভাব জাগে এজন্য তিনি আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে দেন এবং মৃগয়ার পরিবর্তে ধর্মযাত্রা (তীর্থযাত্রা) শুরু করেন।

রাজ্যশাসন ঃ তিনি পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের গায়ে, শিলাখণ্ডে ও স্তম্ভে বৌধধর্মের বাণীগুলি খোদাই করেন। রাজ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি **ধর্মমহামাত্র** নামে একশ্রেণীর কর্মচারীও নিযুক্ত করেন। প্রজাদের কল্যাণ কামনায় তিনি পথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। কাশীর নিকট সারনাথের স্তম্ভের সিংহমূর্তি তাঁর সময়ের শিল্পকলার উন্নত নিদর্শন। এটি অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত।

তিনি অহিংসা ও নৈতিক ধর্মের দ্বারা মানুষের চরিত্র উন্নত করে শান্তিময় স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাই অশোক শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর আনুমানিক খৃীষ্টপূর্ব ১৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয়। অশোকের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণের দুর্বল শাসনের ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হয়। তখন গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে।

কণিষ্ক ঃ কুষাণ সাম্রাজ্য (৭৮-১০১ খৃীঃ) ঃ কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার ইউচি নামে যাযাবর জাতির এক শাখা। কণিষ্ক ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। উত্তর ভারতের বারাণসী থেকে এশিয়ার কাশগড়, খোটান ও ইয়ারখন্দ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি চীন দেশকে যুদ্ধে পরাজিত করে এক চীন রাজ-পুত্রকে নিজের রাজ্যে জামিন হিসাবে রেখেছিলেন। তাঁর রাজধানী পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) ছিল এক সমৃদ্ধ নগর। এখানে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তখন তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র। কণিষ্ক পণ্ডিত ও গুণী-ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। তাঁর আমলে গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধরীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট 'গান্ধার শিল্পের' যথেষ্ট উন্নতি হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর অনেকদিন পর্যন্ত ভারতে

কোন বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশেষে মগধে গুপ্ত সম্রাটরা এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। পাটলিপুত্র ছিল তাঁর রাজধানী। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিহাসনে বসেন।

সমুদ্রগুপ্ত ঃ (আঃ ৩৪০-৩৭৬ খ্রী) ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এই বংশের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি প্রথমে উত্তর ভারত জয় করেন। তারপর তিনি দক্ষিণ ভারতের বহু রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু এইসব রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা মাত্র তিনি তাদের রাজ্য ফিরিয়া দেন। পূর্ব ভারতের কামরূপ (আসাম), সমতট প্রভৃতি রাষ্ট্র এবং উত্তর পশ্চিমের কুষাণরাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। ফলে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে যমুনা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত শুধুমাত্র বীর ছিলেন না, একাধারে শিল্পী, কবি, বীণাবাদক, সুশাসক ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ঃ (আঃ ৩৭৬-৪১৪ খ্রীঃ) ঃ সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করে। বীরত্বে তিনিও ছিলেন পিতার সমকক্ষ। পশ্চিম ভারতের শকদের পরাজিত করে তিনি শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। উজ্জয়িনীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাদর করতেন। তাঁর রাজসভায় কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, প্রভৃতি নয়জন পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের নবরত্ন বলা হতো। তাঁর রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ) শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজাগণ ছিলেন দুর্বল। তখন বার বার হূণ আক্রমণ, রাজপরিবারের কলহ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

(ঙ) প্রাচীন বাংলার কথা

প্রাচীন বাংলার পরিচয় ঃ প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোন এক বিশেষ দেশ ছিল না। বর্তমান যে দেশকে বাংলা বলা হয়, সেকালে তার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তর অংশ পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমে রাঢ় আর দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে বঙ্গ, সমতট, বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণের (পুণ্ড্র ও রাঢ়) কতক অংশ **'গৌড়'** নামে পরিচিত ছিল। তবে এই সব অঞ্চলের সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। তাই প্রাচীন বাংলার সীমা নির্দেশ করা কঠিন।

বৈদিক সাহিত্যে বাংলার কথা ঃ অথর্ববেদে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অসুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এদের দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, বাংলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অনার্য, জাতিতে এরা ছিল নিষাদ। এখানকার কোল, মুণ্ডা সাঁওতাল প্রভৃতি গোষ্ঠি এই শ্রেণীভুক্ত। এরা চাষবাস করে জীবিকা অর্জন করতো। এরপর দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতির লোকেরা বাংলাদেশে বসবাস শুরু করে। এরা পরে আর্যদের সংগে মিশে বর্তমান বাঙালী জাতির সৃষ্টি হয়। বৈদিক যুগের শেষ ভাগেই বাংলাদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। ফলে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

রামায়ণ মহাভারতে বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। বঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি দেশের রাজারা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন জৈন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থেও রাঢ়, বঙ্গ ও পুণ্ড্রের উল্লেখ আছে। মিলিন্দ পঞহো নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গকে একটি সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় বাংলা ঃ গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় গঙ্গারিডই নামে এক শক্তিশালী জাতি বাংলাদেশে বাস করতো। গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, গঙ্গারিডইদের বিশাল হস্তীবাহিনী ও বীরত্বের কথা শুনে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভীত হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

মৌর্যযুগে বাংলা ঃ মৌর্যযুগে বাংলা দেশ পাটলিপুত্রের অধীন ছিল। এই সময় বাইরের অনেক দেশের সাথে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলের সাথে বাংলার যোগসূত্র এই সময়ে স্থাপিত হয়।

গুপ্ত যুগে বাংলা ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলার কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাংলার পূর্বভাগ সমতটে সমুদ্রগুপ্তের অধীনে এক করদ রাজ্য ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে সমস্ত বাংলা দেশই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে আবিষ্কৃত কয়েকখানি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় সেখানে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত শাসকের অধীনে ছিল।

(চ) ॥ ভারতীয় সমাজ ও বাণিজ্য বৈদেশিক প্রভাব ॥

ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা আর অন্য তিনদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। এই দুর্ভেদ্য বাধা সত্ত্বেও অতি প্রাচীন কাল থেকে বৈদেশিক শক্তিগুলি বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে, আবার ভারতীয় স্থলপথে এবং জলপথে বিদেশের সাথে যোগাযোগও স্থাপন করেছে। ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্য অন্যদেশে সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বৈদেশিক প্রভাবে কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

সমাজ ঃ গ্রীক, শক, পহলব, কুষাণ ও হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতিগুলি এদেশে রাজ্য স্থাপন করে। ক্রমে তারা ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করে এদেশের জনসমাজে মিশে যায় ; ফলে ভারতীয়দের সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা শিথিল হয়। চন্দ্রগুপ্তের সাথে গ্রীকরাজ সেলুকাসের কন্যার বিবাহ এবং শক রাজবংশের সাথে সাতবাহন রাজবংশের বৈবাহিক সম্পর্কই এর প্রমাণ। আবার নূতন নূতন জাতির লোকেরা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, বর্ণাশ্রম প্রথার ভিতরেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারবর্ণের জায়গায় বহু বর্ণসংকর এবং নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

বাণিজ্য ঃ বৈদেশিক জাতিগুলির ভারত আক্রমণের ফলে বিদেশের সাথে যোগাযোগের নূতন নূতন রাস্তা আবিষ্কৃত হয়। ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের নিবিড় বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে স্থলপথে একদিকে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য এবং অপর দিকে আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার বহু বণিক

ব্যবসা করতে যেত এবং পণ্যের আদান প্রদান হতো। মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে ভারত হতে সুদূর চীন পর্যন্ত কয়েকটি বাণিজ্য পথ বিস্তৃত ছিল। ফলে মধ্যে এশিয়ার কাশগড়, খোটান, তুরফান, কুচা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে। আবার জলপথে, পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের বহু বন্দর এবং পূর্ব ভারতের তাম্রলিপ্ত ও অন্যান্য বন্দর থেকে তেমনি মালয়, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতির সাথে বাণিজ্য করতে যেত। উর্বরতা ও খনিজ দ্রব্যের জন্য এসব অঞ্চল ভারতীয়গণের নিকট 'সুবর্ণভূমি' বলে পরিচিত ছিল। সে যুগে ভারতে তৈরি রেশম ও পশমের বস্ত্র, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি সুন্দর সুন্দর অলংকার প্রভৃতি জিনিসের চাহিদা বিদেশের বাজারে ছিল। তবে পশ্চিমে এশিয়া ও ইউরোপের দেশগুলির সাথে ভারতের কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, কিন্তু মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্যের সূত্র ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। স্থানীয় অধিবাসিগণ ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র —প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। আজও এসবদেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব দেখা যায়।

(ছ)॥ মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন-এর বর্ণনায় ভারতীয় সমাজ॥

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ এবং গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন। এঁরা দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন এবং সে সময়কার দেশের অবস্থা সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন। এঁরা উভয়েই সেই সময়ের উন্নত শাসনব্যবস্থা, দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি, ভারতবাসীর উন্নত চরিত্র, তাদের সুশীল বৈশিষ্ট্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

মেগাস্থিনিসের দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজ : সেলিউকাস প্রেরিত দূত হিসাবে মেগাস্থিনিস প্রায় পাঁচ বছর চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে ছিলেন। তাঁর রচনা ইণ্ডিকা দুর্ভাগ্যক্রমে লুপ্ত হয়েছে কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকদের উদ্ধৃতি থেকে আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণ সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি লিখে গেছেন যে, সেকালের ভারতীয় সমাজ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—দার্শনিক কৃষক, শিকারী ও পশুপালন, কারুশিল্প, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও অমাত্য। এই সাত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ ছিল। নিজ পেশা কেউ ত্যাগ করতে

পারত না। এরা সকলেই ছিল স্বাধীন। মেগাস্থিনিস ভারতে দাসপ্রথা দেখতে পান নি। ভারতীয়গণের উন্নত নৈতিক চরিত্র ও শৃঙ্খলাবোধের কথা তিনি বলেছেন। তারা মিথ্যা কথা বলত না। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা খুবই কম হত। চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। বেশির ভাগ লোকই আহারে ও ব্যসনে রুচিবোধের পরিচয় দিত। যজ্ঞের সময় ছাড়া কেহ সুরাপান করত না। ভারতীয়গণ অলংকারপ্রিয় ছিল এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলংকার পরিধান করত। সমাজে বহু বিবাহের প্রথা ছিল। শিকার যাত্রা রাজার প্রিয় অবসর বিনোদন ছিল। ষাঁড়, হাতী প্রভৃতি পশুর যুদ্ধ জনগণের আগ্রহের বিষয় ছিল। মেগাস্থিনিস দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য ও অফুরন্ত খনিজ সম্পদের কথা বলেছেন। তিনি জলসেচ ব্যবস্থা ও পূর্তকর্মের প্রশংসা করেছেন। মেগাস্থিনিসের মতে নারীরা সেই যুগে বিশেষ সমাজের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল।

ফা-হিয়েনের দৃষ্টীতে ভারতীয় সমাজ ঃ মেগাস্থিনিসের সাত'শ বছর পরে ভারতে এসেছিলেন চীন দেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক **ফা-হিয়ান**। এই সময়ে মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ফা-হিয়েন প্রায় পনর বছর ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মতে রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল একটি অতিশয় সমৃদ্ধ নগর। এখানকার অধিবাসীরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করত। তিনি বলেছেন যে, চণ্ডাল ও নীচ জাতি ছাড়া কেউ প্রাণীহত্যা করত না, মদ, মাছ-মাংস, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি তারা খেত না। বাজারে মাছ মাংস বিক্রী হতো না, বাড়িতে কেউ শুয়োর মুরগী পুষত না। চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য ছিল। অপরাধীদের শাস্তি খুব কঠোর ছিল না। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো না বললেই চলে। ইচ্ছামত রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া আসা যেত। কোনরূপ বাধা নিষেধ ছিল না।

ফা-হিয়েনের বিবরণীতে অনেক বৌদ্ধ সংঘারামের উল্লেখ আছে। এখানে বৌদ্ধ শ্রমণরা থাকতেন। এক মথুরা নগরেই কুড়িটি সংঘারাম ছিল। এই সংঘারামের জন্য ধনী লোকেরা ভূমিদান করতেন।

(জ) ॥ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, শিক্ষা ও সাহিত্য ॥

স্থাপত্য ও চিত্রকলা ঃ প্রাচীনকালে স্থাপত্য এবং চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ভারত যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। বৈদিক যুগের পাথরের তৈরী দুর্গ ও দেবদেবীর

মূর্তি উন্নত ভাস্কর্য বিদ্যার পরিচয় বহন করে। মৌর্য যুগে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি দেখা দেয়। প্রায় মুসলমান আক্রমণের কাল পর্যন্ত এই উন্নতির ধারাটি অবিচ্ছিন্ন ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের সারদিকে কাঠের প্রাচীন তোরণ ও গম্বুজগুলি অপূর্ব কারুকার্য মণ্ডিত ছিল। নন্দনগড়, লুম্বিনী, সারনাথ, সাঁচী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত স্তূপ ও স্তম্ভগুলি মৌর্যযুগের উন্নত শিল্পকলার স্বাক্ষর বহন করে। সারনাথের সিংহমূর্তি ও ধর্মচক্র এবং বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির স্থাপত্য শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বহু বিদেশী জাতি এদেশে আসার ফলে শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। ভারতীয় ভাব এবং গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির সমন্বয়ে 'গান্ধার শিল্প' নামে এক নূতন শিল্পধারার সৃষ্টি হয়। শিল্প রচনার এই ধারাটি কুষাণ যুগেও অব্যাহত ছিল। মথুরা, বুদ্ধগয়া, সাঁচী, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পকলার বহু নিদর্শন দেখা যায়। কণিষ্কের রাজত্বকালে নির্মিত পুরুষপুরের চৈত্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তযুগের স্থাপত্য ঃ এ যুগের শিল্পকীর্তিগুলির মধ্যে দেওগড়ের পাথরের তৈরী দশাবতার মন্দির এবং ভিতর গাঁও-এর ইটের তৈরী মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড় খোদাই করে গুহা নির্মাণ ছিল এযুগের স্থাপত্যের অপর বৈশিষ্ট্য। হায়দ্রাবাদের অজন্তা, মহারাষ্ট্রের ইলোরা ও গোয়ালিয়রের বাসগুহা এদের মধ্যে অন্যতম। এই গুহাগুলির দেয়ালে আবার সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে।

শিক্ষা ঃ প্রাচীনকালে ছাত্ররা প্রায়ই গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করতো। ছাত্র ও শিক্ষকেরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ছাত্র গুরুর জীবন হতে উচ্চ আদর্শের শিক্ষা লাভ করতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানার্জন চরিত্র গঠন এবং সামাজিক কর্তব্য ও ধর্মীয় আচার সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করা।

তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তক্ষশীলাই ছিল ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র। গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের পিতা বিক্রমাদিত্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এটি ছিল তৎকালীন এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। দেশ বিদেশের প্রায় দশ হাজার ছাত্র এখানে একসাথে থেকে পড়াশুনা করতো। বৌদ্ধধর্ম ছাড়া এখানে বেদ, তর্কবিদ্যা ব্যাকরণ, চিকিৎসা

বিদ্যা, অর্থবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। গুপ্তযুগে সংগীত শিক্ষারও উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মূর্তি সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় দেয়।

সাহিত্য ঃ আর্যজাতির ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বেদ প্রথম সৃষ্টি। কাব্যরসের দিক থেকে যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমতুল। পুরাণ নামে হিন্দুদের প্রাচীন এক শ্রেণীর সাহিত্য ভারতীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' জৈন ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র' এবং বৌদ্ধগ্রন্থ 'কথাবস্তু' এযুগে রচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কুষাণ যুগে বৌদ্ধপণ্ডিত বসুমিত্র ও নাগার্জন, ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলি, দার্শনিক অশ্বঘোষ প্রভৃতি মনীষীগণ তাঁদের লেখার দ্বারা এ যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন; মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি কাব্য এবং 'শকুন্তলা' নাটক বিশ্বসাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। এছাড়া শূদ্রকের নাটক 'মৃচ্ছকটিক', ও বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি হরিষেণ এবং গদ্যসাহিত্যের রচয়িতা দণ্ডিনও তাঁদের রচনার দ্বারা ও এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

বিজ্ঞান চর্চা ঃ প্রাচীন যুগে ভারতীয়গণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন এবং সমসাময়িক কালে অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়। কণিষ্কের রাজত্বকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে চরক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর লেখা চরক সংহিতা আজও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ। শল্যবিদ্যা বিশারদ সুশ্রুত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে বাণভট্ট ও ধন্বন্তরী এ সময়ে খ্যাতিলাভ করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ঃ বৈদিক যুগে আর্যগণ জ্যোতির্বিদ্যায়ও বিশেষ উন্নত ছিল এবং তাদের তিথি-নক্ষত্র এবং রাশি সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। গুপ্তযুগের জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট প্রথম প্রকাশ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং তার নিজের চারিদিকে ঘোরার ফলে দিন রাত্রি হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় তার কারণ বিশ্লেষণ করেন।

রসায়ন শাস্ত্র ঃ প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকেই ভারত রসায়ন শাস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিল, যেমন—মরচে ধরেনা এমন ইস্পাত তৈরী, খনিজ লোহা থেকে হাতিয়ার তৈরী, যুগোপযোগী পিতল, কাঁসা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর জিনিসপত্র তৈরীতে ভারতবাসী ছিল বিশেষ পারদর্শী। দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ প্রাচীন যুগে ভারতের ধাতু শিল্পের উন্নতির নিদর্শন।

অংকশাস্ত্র ঃ অংকশাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। গুপ্তযুগে ভারতীয়রাই এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের আবিষ্কার করে। এ ছাড়া গুপ্তযুগে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় মনীষীগণ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন — ৯ নম্বর

১। আর্যজাতি ও বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
২। আর্যদের ভারতে আগমন সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিবরণ দাও। [৫+৪]
৪। অশোকের ধর্ম-বিজয় সম্পর্কে কি জান ?
৫। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?
৬। কুষাণ সাম্রাজ্যের বিবরণ দাও।
৭। সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৮। মেগাস্থিনিস কে ছিলেন ? তাঁর দৃষ্টিতে ভারতীয় সমাজের বর্ণনা দাও। [২+৭]
৯। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতীয় সমাজের কি চিত্র ফুটে উঠেছে ?
১০। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবদান সংক্ষেপে লেখ।
১১। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
১২। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের অবদান কি ?

সংক্ষিপ্ত রচনাত্মক প্রশ্ন — ৩ নম্বর

১। বেদ কয়টি এবং কয় ভাগে বিভক্ত ? [১+২]
২। বেদকে শ্রুতি বলা হয় কেন ?
৩। আর্যদের রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। মহাবীরের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লিখ।
৫। অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি ?

———